নরপিশাচ-৩

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

এক

আবার মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো।

ওদের জন্যে আলাদা কোয়ার্টার-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে, পথ দেখিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেল চাখার সিং-এর সেক্রেটারি। বিল্ডিংগুলোর ছাদে ঝমাঝম একটানা শব্দ করছে বৃষ্টি, ভিজে মাটি থেকে বাষ্প উঠছে প্রচুর—গোধূলির ম্লান আলোয় পাতায় ছাওয়া বনভূমিতে নীল ধোঁয়ার মত লাগছে।

ভবনগুলোর মাঝখানে কাঠের তক্তা ফেলে আসা-যাওয়ার পথ করা হয়েছে। সেক্রেটারি ওদের প্রত্যেককে একটা করে সস্তা প্লাস্টিকের ছাতা দিল।

অতিথিদের কোয়ার্টার মানে এক সারি ঘর—লম্বা একটা একচালাকে মাঝখানে পার্টিশন দিয়ে ছোট ছোট খুপরিতে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ঘরে একটা করে বিছানা, চেয়ার, ডেস্ক আর কাবার্ড। একচালার মাঝখানে সবার জন্যে একটাই বাথরুম।

নিজের কামরাটা সাবধানে পরীক্ষা করল রানা। দরজার তালা এতই বাজে মনে হলো, জোরে টান দিলে নির্ঘাৎ খুলে যাবে। তাছাড়া, ওর কোন সন্দেহ নেই, একটা চাবি অবশ্যই নিজের কাছে রেখেছে চাখার সিং। বিছানার ওপর মশারি তো আছেই, মশারির কাপড় দিয়ে তৈরি পর্দাও রয়েছে জানালায়। দেয়ালগুলো এত পাতলা, পাশের কামরায় ক্যাপটেন শোল-এর হাঁটাচলা পরিষ্কার টের পাচ্ছে ও।

ব্যাপারটা তাঁহলে দাঁড়াল, সেঙ্গি সেঙ্গিতে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় থাকতে হবে ওকে। ওকে সাহায্য করার কেউ নেই, ওর সঙ্গে কোন অস্ত্রও নেই। রানার ঠোঁটে বিদ্রূপাত্মক বাঁকা হাসি, ভাবছে অসম এবং বিপজ্জনক একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। প্রশ্ন হলো, ওকে খতম করার প্রথম চেষ্টাটা কখন করবে চাখার সিং। রানা তাকে চিতাবাঘের মুখে ছেড়ে আসায় একটা হাত হারিয়েছে বেচারা, সেই হাতের বদলে রানার প্রাণ তো কেড়ে নিতে চাইবেই সে। তবে, এখুনি হয়তো নয়। মঞ্চে চঙমঙ গঙ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে। তাছাড়া, প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি স্বয়ং প্রজেক্ট সাইট দেখতে আসছেন, তাঁর উপস্থিতিতে খুন-খারাবির মধ্যে যাবে বলে মনে হয় না। তবে দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে আলাদা কথা।

সিনিয়র স্টাফদের মেসে ডিনার পরিবেশন করা হলো। দ্বিতীয় একটা একচালাকে বার ও ক্যানটিন হিসাবে সাজানো হয়েছে। সোফিয়াকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে রানা দেখল, তাইওয়ানিজ চীনা আর ইংরেজরা আগেই প্রায় সব চেয়ার দখল করে ফেলেছে। নিজেদের ভাষায় একযোগে কথা বলছে সবাই, সিগারেটের ধোঁয়ায় দম আটকে আসার অবস্থা। ওরা সবাই এঞ্জিনিয়ার ও টেকনিশিয়ান—চীনারা চঙমঙ গঙের লোক, ইংরেজরা স্যার ট্যাফোর্ডের। ইউডিসি অর্থাৎ

উবোমো ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন নামে যৌথ ব্যবসা শুরু করেছেন ওঁরা, উদ্দেশ্য দেশটাকে নিঙড়ে ছিবড়ে বানানো। প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারিও ওঁদের সঙ্গে মধু খাচ্ছেন, তিনিও প্রতিষ্ঠানটার গোপন অংশীদার।

ওরা ঢুকতে সবাই একবার করে রানার দিকে তাকাল বটে, তবে তাদের দৃষ্টি কেড়ে নিল উদ্ভিন্নযৌবনা সোফিয়া। ব্রিটিশরা টেবিলে বসে তাস খেলছে ও মদ্যপান করছে, তাদের কেউ কেউ সিগার দিল।

রানা লক্ষ করল, তাইওয়ানিরা আলাদা জায়গায় বসেছে। ওর মনে হলো, দুটো দলের মধ্যে ঠাণ্ডা একটা উত্তেজনার ভাব আছে। ওর সন্দেহ যে সত্যি সেটা প্রমাণিত হলো একজন ইংরেজ এঞ্জিনিয়ারের অভিযোগ শুনে। রানাকে সে জানাল, ইউডিসি-র দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে ব্রিটিশ এঞ্জিনিয়ার ও ম্যানেজারদের বরখাস্ত করছেন চঙমঙ গঙ, তাদের বদলে নিজের দেশের চীনাদের চাকরি দিচ্ছেন।

একটু পরই ইংরেজদের সঙ্গে ভিড়ে গেল সোফিয়া ক্যারল, ডিনারের পর তাকে রেখেই মেস থেকে বেরিয়ে এল রানা। ওকে দরজার দিকে এগোতে দেখে জুয়ার টেবিল ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে এল সে, হাতে মদের গ্লাস। রানার পথ আগলে দাঁড়াল সে, সহাস্যে ফিসফিস করল, 'যাও, রানা, খালি বিছানা উপভোগ করো।' রানা তাকে একাধিক বার প্রত্যাখ্যান করায় এখনও খুব খেপে আছে সে।

নিঃশব্দে হাসল রানা, বলল, 'এরকম ভিড় আর হৈ-চৈ আমি সহ্য করতে পারি না।'

কাদায় পিচ্ছিল হয়ে আছে কাঠের তক্তাগুলো, ওগুলোর ওপর দিয়ে অন্ধকারে হাঁটার সময় ওর পিঠের একটা জায়গা শিরশির করতে লাগল। ওই জায়গাটায় ওর পিছু নেয়া কোন লোক একটা ছুরি গাঁথতে পারে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল রানা।

নিজের কামরার সামনে এসে থামল ও। তালা খুলে কবাট ধাক্কা দিল, হাঁ হয়ে গেল দরজা। দাঁড়িয়ে থাকল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকল না। অন্ধকার কামরায় ওর অপেক্ষায় থাকতে পারে কেউ। এক মিনিট পর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুধু একটা হাত ঢোকাল রানা, চৌকাঠের পাশটা হাতড়ে খুঁজে নিল সুইচবোর্ড। আলো জ্বালার পরও সাবধানে ভেতরে ঢুকল ও। দুর্বল দরজায় তালা দিল, পর্দা টানল জানালার, তারপর বিছানায় বসে জুতোর ফিতে খুলল।

কাজটা অনেকভাবেই করতে পারে চাখার সিং। সবদিক থেকে নিজেকে পাহারা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এই সব ভাবছে, হঠাৎ রানা অনুভব করল চাদরের নিচে কি যেন নড়ছে। নড়ার গতি অত্যন্ত মন্থর ও সতর্ক, আলতো ঘষা খাওয়ার একটা ভাব রয়েছে; পাতলা চাদরের ভেতর থেকে ওর উরু স্পর্শ করল। ভয়ের একটা হিমশীতল স্রোত উঠে এল শিরদাঁড়া বেয়ে, শরীরের প্রতিটি পেশীকে আড়ষ্ট করে দিল।

এখনও দেখা যাচ্ছে না, তবে আছে, এ-ধরনের সাপকে সাংঘাতিক ভয় পায় রানা। কোত্থেকে হঠাৎ ছোবল মারবে, নিজেকে রক্ষা করার কোন সুযোগই পাওয়া যাবে না। এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবে ধরে নিল ও, চাদরের তলায় একটা সাপই নড়াচড়া করছে। বুঝতে পারল, চাখার সিং বা তার কোন লোক ওটাকে রেখে

গেছে এখানে। জানা কথা, মারাত্মক বিষধর কোন সাপই হবে–গোক্ষুর, মামবা অথবা কেউটে; আবার অ্যাডারও হতে পারে।

বিছানা ছেড়ে লাফ দিল রানা, চরকির মত আধপাক ঘুরল। হাতে কিছু পাবার জন্যে দ্রুত এদিক-ওদিক তাকাল। খপ করে তুলে নিল পাতলা কাঠের চেয়ারটা, মেঝেতে আছাড় মেরে ভাঙল সেটা, অস্ত্র হিসেবে বাগিয়ে ধরল একটা পায়া। হাতে অস্ত্র পেয়ে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল রানা, হাপরের মত হাঁপাচ্ছে দেখে লজ্জা পেল। নিজের কনসেশনে বাঘ, হাতি, মোষ, গণ্ডার আর সিংহ মেরেছে যে লোক, যে-লোক প্যারাশুট নিয়ে শত্রুদের এলাকায় নেমে খালি হাতে লড়েছে, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাতে ভেলায় চড়ে একা পাড়ি দিয়েছে উন্মত্ত সাগর, সেই লোকই কিনা এখন কল্পনায় সাপ দেখে এভাবে কাঁপছে আর হাঁপাচ্ছে!

চাদরের তলায় ওটা কি দেখার জন্যে বিছানার দিকে এগোতে হবে ওকে। নিজেকে শক্ত করল রানা, সাবধানে এগোল। বাম হাত দিয়ে চাদরের একটা কোণ ধরল, অপর হাতে ধরা চেয়ারের পায়াটা তুলল মাথার পাশে, তারপর দ্রুত উঁচু করল চাদরের প্রান্তটা।

ডোরাকাটা বুনো একটা ইঁদুর বসে রয়েছে বিছানার মাঝখানে। তার গোঁফগুলো সাদা ও লম্বা, বোতাম আকৃতির চোখগুলো হঠাৎ আলো পড়ায় মিটমিট করছে।

হাতের পায়াটা আগেই নেমে আসতে শুরু করেছে, কোনরকমে সেটাকে থামাল রানা। ইঁদুর আর ও, পরস্পরের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। তারপর ওর কাঁধ দুটো ঝুলে পড়ল, নার্ভাস হাসির সঙ্গে ঝাঁকি খেল সারা শরীর। চিঁচিঁ করে বিছানা ছেড়ে নেমে গেল ইঁদুরটা, মেঝের কিনারা ধরে ছুটল, বেরিয়ে গেল চৌকাঠের ফাঁক গলে। বিছানায় ধপাস করে বসে পড়ল রানা, এখনও হাসছে। 'মাই গড, চাখার সিং!' মনে মনে ভাবছে ও। 'তারমানে তুমি নাছোড়বান্দা! ইঁদুর পাঠিয়ে তুমি আমাকে চ্যালেঞ্জ করছ, কেমন? আমাকে বিড়াল সাজতে বলছ?'

হেলিকপ্টারটা এল পুবদিক থেকে। গভীর বনভূমির পাতায় ছাওয়া ছাদে একটা ফাঁক রয়েছে, সেই ফাঁকে দেখতে পাবার অনেক আগেই ওটার রোটর ব্লেডের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। ফাঁকা জায়গাটায় এমন ভঙ্গিতে নামল, যেন মোটা এক ভদ্রমহিলা তাঁর সমস্ত অঙ্গসৌষ্ঠব ও আত্মমর্যাদা বজায় রেখে শৌচাগারে বসলেন।

ফরাসীদের তৈরি একটা পুমা, চেহারা দেখেই বোঝা যায় অনেক ধকল গেছে ওটার ওপর দিয়ে, সম্ভবত উবোমোয় পৌঁছুনোর আগে একাধিক এয়ারফোর্সে সার্ভিস দিয়েছে।

এঞ্জিন বন্ধ করল পাইলট, ধীরে ধীরে গতি হারিয়ে থেমে গেল রোটর। মেইন হ্যাচ থেকে বেরিয়ে এলেন প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি। তাঁর নড়াচড়ার মধ্যে ক্ষিপ্রতার একটা আভাস আছে, যেন প্রচণ্ড দৈহিক শক্তিকে লাগাম পরিয়ে বেঁধে রেখেছেন। পরনের কমব্যাট ফ্যাটিগ ও প্যারাশুটিস্ট'স বুট তাঁর চেহারায় এনে

দিয়েছে অজেয় বীরযোদ্ধার ভাব। ক্যামেরা নিয়ে সামনে বাড়ল সোফিয়া, বুকে সাঁটা মেডেল রিবনের মতই উজ্জ্বল ও চওড়া হাসি দিলেন তিনি। চাখার সিং-এর নেতৃত্বে এক সারিতে দাঁড়ানো রিসেপশন কমিটির দিকে এগোলেন।

তাঁর পিছনে পুমা থেকে নামার জন্যে বোর্ডিং ল্যাডারটা ব্যবহার করছেন চঙমঙ গঙ। তাঁর পরনে ক্রীম কালার ট্রপিক্যাল সুট। চীনা ধনকুবেরের পৈশাচিক দৃষ্টি মাত্র এক পলকের জন্যে স্থির হলো রানার মুখে–যেন বিষধর কেউটের জিভ চেটে দিল। তাঁর চেহারায় কোন পরিবর্তন ঘটল না। রানাকে চিনতে পারার কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না আচরণে, তবে রানা খুব ভাল করেই জানে যে চাখার সিং কোন না কোনভাবে তার গুরুকে নিশ্চয়ই সতর্ক করে দিয়েছে। রানা যে উবোমোয়, এটা চঙমঙ গঙের জন্যে নতুন কোন খবর নয়।

নিজের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে বিস্মিতই হলো রানা। হেলিকপ্টারে যে চঙমঙ গঙ থাকবেন, ও জানত। দেখা হতে যাচ্ছে, কাজেই শরীরটাকে শক্ত করে রেখেছিল ও, কিন্তু তারপরও শারীরিক আঘাতের মত প্রচণ্ড ধাক্কা খেল, কেউ যেন পাঁজরে ঘুসি মেরেছে। প্রেসিডেন্টের বাড়ানো হাতটা ধরে ঝাঁকাবার সময় মুখে হাসি ফোটাতে রীতিমত চেষ্টা করতে হলো ওকে।

'এই যে, আমাদের ভালমানুষ মিস্টার মাসুদ রানা–দেখতেই পাচ্ছেন, প্রিয় নবী নিজেই পাহাড়ের কাছে চলে এসেছেন। আপনার ছবি তোলার কাজে সহযোগিতা করার জন্যে আজকের বিকেলটা আলাদা করে রেখেছি। বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি। আপনার নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় এক পায়ে খাড়া।'

'ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট। সব মিলিয়ে আপনার পাঁচ ঘণ্টা সময় নেব আমরা–তার মধ্যে মেকআপ আর রিহার্সেলও ধরা হয়েছে…,' চঙমঙ গঙের দিকে ইচ্ছে করেই তাকাল না রানা।

তবে ওকে বাধা দিল চাখার সিং। 'মি. রানা, আসুন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ইউডিসি-এর হেড, মি. চঙমঙ গঙের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।'

চঙমঙ গঙের বাড়ানো হাতটা ধরার সময় রানার মনে হলো, গোটা ব্যাপারটা স্বপ্নের ভেতর ঘটছে যেন। জোর করে হাসল ও। বলল, 'স্পরস্পরকে আমরা চিনি। জিম্বাবুইয়ে দেখা হয়েছিল, আপনি যখন ওখানে রাষ্ট্রদূত ছিলেন। আপনার বোধহয় মনে পড়ে না?'

'মাফ করবেন।' মাথা নাড়লেন চঙমঙ গঙ। 'অফিশিয়াল দায়িত্ব পালনের সময় কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, সবার কথা কি মনে রাখা সম্ভব!' হাসিমুখে ভান করলেন রানাকে তিনি চিনতে পারছেন না। বিশ্বাস করা কঠিন মনে হলো যে এই ভদ্রলোককে জাম্বেজি উপত্যকার ঢালে শেষবার দেখেছে রানা, আলি শাহ আর তার পরিবারের ক্ষতবিক্ষত লাশ আবিষ্কার করার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে। মনে হলো, এতদিন চেপে রাখায় ওর ভেতর শোক আর ক্রোধ আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। ওর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল, 'শালা কসাই।' ইচ্ছে করল শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে লোকটার মুখে ঘুসি মারে, বদলে দেয়

চেহারা, হাড় ভাঙার শব্দ শোনে, বাঁকা আঙুল ঢুকিয়ে বের করে আনে চোখের মণি। ইচ্ছে হলো চণ্ডমণ্ড গণ্ডের রক্তে নিজের হাত ধোয়।

যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল রানা। নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এই প্রথম ওর বিবেক নির্দেশ দিল, কি করতে হবে ওকে। লোকটা যাতে শাস্তি পায় সেজন্যে আইনের সাহায্য চাওয়ার দরকার নেই। চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে নিজের হাতে খুন করতে হবে। হয় খুন করতে হবে, নয়ত তাঁর হাতে খুন হতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

এটা ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার নয়। পবিত্র একটা দায়িত্ব। প্রতিজ্ঞাপূরণ। বন্ধু আলি শাহের লাশ ছুঁয়ে উচ্চারণ করা প্রতিশ্রুতি রক্ষা। এই প্রতিশোধ হবে বন্ধুত্বের দাবি।

'আপনাদের মনে হতে পারে আমি একটা যুদ্ধজাহাজের ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছি...,' ক্যামেরার লেন্সে তাকিয়ে হাসলেন প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি, 'কিন্তু আশ্বাস দিয়ে বলছি, তা আমি দাঁড়িয়ে নেই। এটা আসলে এক নম্বর মোবাইল মাইনিং ইউনিটের কমাণ্ড প্ল্যাটফর্ম, সংক্ষেপে আদর করে ডাকা হয় মোমু বলে।'

ক্যামেরায় সোফিয়া একা শুধু সিমন সাফারিকে ধরে রাখলেও, প্ল্যাটফর্মের বাকি অংশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কমাণ্ড অফিসাররা। চীফ এঞ্জিনিয়ার ও জিওলজিস্ট ব্রিফ করেছেন প্রেসিডেন্টকে, টেকনিক্যাল বিবরণগুলো তিনি যাতে ঠিকমত বুঝতে পারেন। ইউনিটের ক্রুরা এখনও মোমু কমাণ্ড কনসোল-এ যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে, এমন কি রাষ্ট্রপ্রধানের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সফরের সময়ও জটিল মেশিনটা অচল রাখা যাবে না।

সিকোয়েন্সটা পরিচালনা করছে রানা, চণ্ডমণ্ড গণ্ড ও চাখার সিং স্রেফ দর্শক, যদিও পিছন দিকে তাঁদের চেহারা দেখা যাচ্ছে। সিমন সাফারির মেকআপ করেছে সোফিয়া নিজে। মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবেও রানা তাকে মূল্য দেয়।

'আমি দাঁড়িয়ে আছি মাটি থেকে সত্তর ফুট ওপরে,' বলে চলেছেন প্রেসিডেন্ট। 'এবং আমি সামনে ছুটছি তীব্র গতিতে, ঘণ্টায় একশো গজ।' নিজের কৌতুকে নিজেই হাসলেন তিনি।

মনে মনে স্বীকার করল রানা, ভদ্রলোক দক্ষ অভিনেতা, ক্যামেরার সামনে কোন রকম দ্বিধায় ভুগছেন না। এই ড্রেস আর চেহারা নিয়ে দুনিয়ার যে-কোন জায়গার মহিলা দর্শকদের মনোযোগ কেড়ে নেবেন।

'যে ভেহিকেলে আমি চড়েছি তার ওজন এক হাজার টন...।'

সিমন সাফারি কথা বলছেন, নিজের শিডিউলে এডিটিং নোট নিচ্ছে রানা। এই পর্যায়ে স্ক্রীনে প্রেসিডেন্টের বদলে দৈত্যাকৃতি মোমু ভেহিকেলকে দেখানো হবে, অনেকগুলো ট্র্যাক-এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ইস্পাতের ট্র্যাক, সব মিলিয়ে বারোটা আলাদা সেট, প্রতিটি দশ ফুট করে চওড়া–অত্যন্ত দুর্গম এলাকাতেও ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম। ইস্পাতের অনেকগুলো হাইড্রোলিক র‍্যাম মেইন প্ল্যাটফর্মটাকে আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রণ করে, ভেহিকেলের তলাটা যাতে ভারসাম্য না হারায়। বনভূমির উঁচু ঢাল বেয়ে ওঠা-নামা বা পিছলে যাবার

সময় ট্র্যাকগুলো উন্মাদের মত আচরণ করে, সেই আচরণের সঙ্গে তাল বজায় রেখেই ভারসাম্য রক্ষা করে র‍্যামগুলো।

সিমন সাফারি কিছু বাড়িয়ে বলেননি, মেশিনটার আকার যুদ্ধজাহাজের চেয়ে ছোট হবে না। লম্বায় ওটা দেড়শো গজের বেশি, চওড়ায় চল্লিশ গজ।

ঘাড় ফেরালেন সিমন সাফারি, হাত বাড়িয়ে রেইলিং-এর ওদিকটা দেখালেন। 'ওই নিচের দিকে,' বললেন তিনি, 'দানবটার চোয়াল আর থাবা দেখতে পাবেন আপনারা। চলুন, চাক্ষুষ করা যাক।'

ক্যামেরায় কথাটা বলা সহজ, কিন্তু এর মানে হলো সুবিধেজনক ও নিরাপদ কোথাও নামতে হবে ওদেরকে, ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়ানোর জন্যে পজিশন ঠিক করতে হবে, ক্যামেরা চালু করার আগে বুঝিয়ে দিতে হবে কার কি ভূমিকা। তবে সিমন সাফারির সঙ্গে কাজ করে শান্তি আছে, মনে মনে স্বীকার করল রানা। একবার বলে দিলেই কি করতে হবে বুঝে ফেলেন। সময়জ্ঞানও নিখুঁত। অভিনয়ে কোন আড়ষ্ট ভাব নেই। মেশিনারির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চিৎকার করতে হবে তাঁকে, এ-কথা বলে দেয়ারও প্রয়োজন হলো না।

উন্নতমানের সিনেমায় এ-ধরনের শট দেখা যায়। একসকাভেইটর অর্থাৎ মাটি খোঁড়ার যন্ত্রগুলো রয়েছে গ্যানট্রি অর্থাৎ প্রকাণ্ড এক কাঠামোর ওপর। একসকাভেইটরগুলোকে দেখে মনে হলো এক পাল ইস্পাতের জিরাফ যেন গলা লম্বা করে ডোবা থেকে পানি খাচ্ছে, প্রতিটি স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করছে, উঠছে ও নামছে। ওগুলোর ব্লেড বিপুলবেগে ঘুরছে, মাটি কেটে ছুঁড়ে দিচ্ছে পিছন দিকের কনভেয়র বেল্টে।

'এই একসকাভেইটরগুলো মাটির গা থেকে ত্রিশ গজ নিচে পর্যন্ত নাগাল পেতে পারে। এই মুহূর্তে ওগুলো ষাট গজ চওড়া একটা ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে–মাটি সরাচ্ছে প্রতি ঘণ্টায় দশ হাজার টনেরও বেশি। ওগুলো কখনও থামে না। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা আবর্জনা সরাচ্ছে।'

লাল মাটি খুঁড়ে মোমু যে খাদটা তৈরি করছে, উঁকি দিয়ে সেই ফাঁকটার ভেতর তাকাল রানা। এই বিশাল গর্তের ভেতর একটা লাশ লুকিয়ে ফেলা খুবই সহজ–বিশেষ করে ওর লাশটা। হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল ও। চণ্ডমণ্ড গণ্ড ও চাখার সিং, দু'জনেই ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। এখনও তারা ওর কাছ থেকে সত্তর ফুট ওপরে কমাণ্ড প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। দুটো মাথা কাছাকাছি, প্রায় ছুঁয়ে আছে পরস্পরকে। কথা বলছে, বোধহয় ওকে নিয়েই। একটানা বজ্রপাতের মত শব্দ করছে কনভেয়র বেল্টগুলো, ঘুরন্ত একসকাভেইটরের মাথাগুলোও গর্জন করছে, কথাগুলো শুনতে পাবার প্রশ্ন ওঠে না। তবে চেহারায় হিংস্র ভাব দেখে বোঝা গেল নিষ্ঠুর কোন সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে ওরা। চোখাচোখি হলো মুহূর্তের জন্যে, তারপর দু'জনেই মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল, একটু পর সরে গেল রেইলিং-এর কাছ থেকে।

এরপর স্বভাবতই কাজে মন দেয়া কঠিন হয়ে উঠল রানার। অথচ সিমন সাফারি যতক্ষণ কাছাকাছি আছেন, প্রতিটি মিনিট ওর কাজে লাগানো দরকার।

আবার একবার ক্যামেরা ক্রুরা ইস্পাতের মই বেয়ে মোমুর সেন্ট্রাল প্ল্যাটফর্মে

উঠল। চঙমঙ গঙ আর চাখার সিং অদৃশ্য হয়েছে। ওদেরকে চোখের সামনে না দেখে রানার অস্বস্তি আরও বাড়ল।

উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে নিচের টিউব মিল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রকাণ্ড আকৃতির চারটে ইস্পাতের ড্রাম, ফিট করা হয়েছে মোমুর ভেকে, বনবন করে ঘুরছে সবগুলো। প্রতিটি ড্রাম চল্লিশ গজ লম্বা, ভেতরে একশো টন ওজনের অসংখ্য লোহার বল আছে। সদ্য খোড়া খাদ থেকে তোলা মাটি কনভেয়র বেল্ট বয়ে নিয়ে এসে ফেলে দিচ্ছে ড্রামগুলোর খোলা মুখের ভেতর। লোহার বলগুলো পাথর আর শক্ত মাটিকে পিষে মিহি পাউডারে পরিণত করছে, টিউব মিলের আরেক প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে এসে সেই লাল পাউডার আলাদা ট্যাংকে ঠাঁই করে নিচ্ছে।

ইস্পাতের ক্যাটওয়াক ধরে খানিকটা নিচে নামল ক্যামেরা ক্রুরা, সেপারেটর-এর খানিক ওপরে এসে থামল ওরা। ক্যামেরার দিকে মুখ করে আবার ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি।

'দুটো মূল্যবান খনিজ পদার্থ উদ্ধার করার চেষ্টা করছি আমরা–দুটোই হয় খুব ভারি নয়তো ম্যাগনেটিক। দুর্লভ আর্থ মোনাজাইট সংগ্রহ করা হয় শক্তিশালী ইলেকট্রোম্যাগনেটের সাহায্যে।' মেশিনের গর্জনে তাঁর কণ্ঠস্বর প্রায় চাপা পড়ে যাচ্ছে। এ-ব্যাপারে রানা অবশ্য উদ্বিগ্ন নয়। প্রেসিডেন্টকে দিয়ে আরেকবার তাঁর বক্তৃতা রেকর্ড করিয়ে নেবে ও। তারপর ডাব করবে টেপ, ফলে টিভির দর্শকরা স্পষ্ট শুনতে পাবে তাঁর গলা।

'মোনাজাইট বের করে নেয়ার পর অবশিষ্ট যা থাকে তা চলে যায় সেপারেটর ট্যাংকে। ওটার ভেতর হালকা পদার্থগুলোকে ভেসে উঠতে দিই আমরা, সংগ্রহ করি ভারি প্লাটিনাম ওর,' বলে চলেছেন সিমন সাফারি। 'অপারেশনের এই অংশটা সাংঘাতিক স্পর্শকাতর। সেপারেটর ট্যাংকে আমরা যদি কেমিক্যাল ক্যাটালিস্ট ও রিজেন্ট ব্যবহার করি, শতকরা নব্বুই ভাগেরও বেশি প্লাটিনাম উদ্ধার করা সম্ভব। তবে ট্যাংক থেকে যে বর্জ্য বেরুবে সেটা হবে বিষাক্ত। মাটি শুষে নেবে সেই বর্জ্য, বৃষ্টির পানির সঙ্গে পৌঁছে যাবে নদীতে, ফলে মারা পড়বে পশু, পাখি, মাছ, পোকা-মাকড় ও উদ্ভিদ। ডেমোক্রাটিক পিপল'স রিপাবলিক অব উবোমোর প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি নির্দেশ দিয়েছি যে প্লাটিনাম মাইনিং অপারেশনের কাজে এ-দেশে কোন রকম কেমিক্যাল রিজেন্ট ব্যবহার করা যাবে না।' থামলেন সিমন সাফারি, ক্যামেরার দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। 'এ-ব্যাপারে আমার তরফ থেকে সম্পূর্ণ আশ্বাস ও সহযোগিতা আপনারা পাবেন। রিজেন্ট ব্যবহার না করলে ওর সংগ্রহ পঁয়ষট্টি পার্সেন্টে নেমে আসবে। তারমানে দাঁড়াবে, দশ বা বিশ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি। তবু আমি ও আমার সরকার এই ক্ষতি মেনে নিতে রাজি, কারণ আমরা চাই না আমাদের পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ুক। আমরা আমাদের সন্তানদের জন্যে, আপনাদের সন্তানদের জন্যে দূষণ মুক্ত পরিবেশ চাই।'

তাঁর বাচনভঙ্গিতে জাদু আছে, সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠলেন। আশ্বাস দেয়ার সময় তাঁর চেহারায় গভীর আন্তরিকতা ফুটে উঠল, দেশের জন্যে তাঁর

অন্তরে দরদ যেন উথলে উঠছে। কে বলবে, কে বিশ্বাস করবে দেশটাকে উনি আক্ষরিক অর্থেই ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন।

'কাট,' নির্দেশ দিল রানা। 'মার্ভেলাস, মি. প্রেসিডেন্ট। আপনি এবার মেসে ফিরে যেতে পারেন। এখানের কাজ শেষ করি আমরা, তারপর বিকেলে ম্যাপ আর মডেল সহ ফাইন্যাল ব্রিফিংয়ের-এর ছবি তুলব।'

আবার উদয় হলো চাখার সিং, যেন আলাউদ্দিনের চেরাগ থেকে আবির্ভূত হলো পাগড়ি পরা জিন। মোমু থেকে সিমন সাফারিকে নিয়ে গেল সে, প্রেসিডেন্টের সম্মানে বেস ক্যাম্পে বিরাট খানাপিনার আয়োজন করা হয়েছে। আগেই খবর পেয়েছে রানা, পুমা হেলিকপ্টার করে কাহালি থেকে আনা হয়েছে খাবার আর পানীয়।

সবাই চলে যাবার পর রানা আর সোফিয়া মোমুর ওপর শেষ সিকোয়েন্সটার কাজ শুরু করল, এখানে সিমন সাফারির কোন ভূমিকা নেই। ওরা ছবি তুলল, হেভী প্লাটিনাম পরিচ্ছন্ন ও গাঢ় একটা স্রোতের মত ওর বিন-এ পড়ছে। প্রতিটি বিন-এর ধারণক্ষমতা একশো টন, ভরে গেলে নিজে থেকেই নেমে যাচ্ছে অপেক্ষারত টেইলর-এ, তারপর টেনে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে টেইলরটাকে।

বেলা তিনটের দিকে মোমুতে শেষ হলো ওদের কাজ। বেস ক্যাম্প সেঙ্গি সেঙ্গিতে যখন পৌঁছুল ওরা, প্রায় শেষ হতে চলেছে প্রেসিডেনশিয়াল লাঞ্চ।

হেডকোয়ার্টার ভবনের কনফারেন্স রুমে মাইনিং কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ সহ একটা স্কেল মডেল আছে, তাতে মোমুর ভূমিকাও দেখানো হয়েছে। মডেলটা এমনভাবে তৈরি, একবার নজর বুলালেই গোটা প্রজেক্ট সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পাওয়া যাবে। স্যার ট্যাফোর্ডের টেকনিশিয়ানরা লণ্ডনে বসে বানিয়েছে ওটা, দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই, খুঁটিনাটি সমস্ত বিবরণই পাওয়া যাবে। প্রতিটি জিনিসের মাপ, আকৃতি, ওজন এবং একটার সঙ্গে অপরটির দূরত্বেরও নিখুঁত হিসেব করে দেয়া আছে।

মডেল, মোমু আর বনভূমি, এই তিনটেকে পালা করে দেখানোর ইচ্ছে রানার। পুমা হেলিকপ্টার থেকে বনভূমির ছবি তুলবে ও, দর্শকদের দেখাবে কিভাবে কাজ করছে মোমু।

স্কেল মডেলে দেখানো হয়েছে মাইনিং ট্রাক ষাট গজ চওড়া। মোমুর সামনে জঙ্গল কেটে রাস্তাটা তৈরি করছে কাঠুরেদের টিম। মাটি সরাচ্ছে অনেকগুলো বুলডোজার। গাছ কাটার কাজটারও ছবি তোলার ইচ্ছে রানার। আকাশ ছোঁয়া বৃক্ষসারির পতন দেখার মত দৃশ্য। দৈত্যাকৃতি হলুদ বুলডোজারগুলো কাটা গাছগুলোকে টেনে বের করে নিয়ে যাচ্ছে জঙ্গল থেকে, শ্রমিকরা সেগুলোকে ট্রাকে তুলছে–এ-সব না দেখালে ছবিটা হবে অসম্পূর্ণ।

তার আগে আজকের ছবি তোলার কাজ সিমন সাফারিকে সঙ্গে নিয়ে শেষ করতে হবে রানাকে। সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল ও, প্রেসিডেন্টকে ঘিরে চঞ্চল বাছুরের মত নাচানাচি করছে সে, কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে ফিসফিস করছে, আবার কখনও হেসে উঠছে খিলখিল করে। রঙ ও পাউডার লাগাচ্ছে সিমন সাফারির মুখে। উপস্থিত সবাইকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে সোফিয়া, পরস্পরকে

ভালবাসে তারা–সম্পর্কটা প্রেমের। প্রচুর মদ খাওয়ায় নিজের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে ততটা সতর্ক নন সিমন সাফারি, প্রকাশ্যেই আদর করছেন সোফিয়াকে, মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে শ্বেতাঙ্গিনীর বিশাল স্তনযুগলকে যেন গিলছেন। সোফিয়াও তার নাকের ডগায় ঠেলে দিচ্ছে ওগুলোকে।

বিপজ্জনক পথ থেকে সরে আসার জন্যে সোফিয়াকে অনেকবার সাবধান করেছে রানা। কিন্তু ওর কথায় কান দেয়নি সে। মেয়েটার জন্যে এখনও রানা উদ্বেগ বোধ করে, তবে উদ্বেগের চেয়ে এখন করুণাই বেশি হয়। ও বুঝতে পারে, সোফিয়া নিজেকে উবোমোর ফার্স্ট লেডি হিসেবে কল্পনা করছে। ঘটনাটা ঘটলে আশ্চর্য হবার তেমন কিছু থাকবে না, কারণ আফ্রিকার কালো নেতাদের অনেকেরই ফর্সা ইউরোপিয়ান স্ত্রী আছে। কিন্তু সোফিয়া জানে না হিটারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে কি রকম আচরণ করে। বরং ব্যাপারটা ঘটলেই ভাল, ভাবল রানা। যে সর্বনাশই ঘটুক তার, নিজেই সেটা ডেকে আনছে সে।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা, দৃষ্টিকটু মাখামাখিতে বাধা দিল। 'মি. প্রেসিডেন্ট, আপনি যদি রেডি হয়ে থাকেন, তাহলে এখানটায় দাঁড়ান, এই টেবিলটার পাশে। সোফিয়া, আমি চাই তুমি শটটা এখান থেকে নেবে। ফোকাসে যেন প্রেসিডেন্ট ও মডেলটা থাকে···।'

উঠে এসে রানার দেখিয়ে দেয়া জায়গায় দাঁড়ালেন সিমন সাফারি। মাত্র কয়েক মিনিট রিহার্সেল হলো। প্রথমবারেই ব্যাপারটা বুঝে নিলেন তিনি।

'ভেরি গুড, মি. প্রেসিডেন্ট। আমরা তাহলে এবার শুরু করতে পারি। সোফিয়া, তুমি রেডি তো?'

সিমন সাফারির হাতে ছড়িটা পালিশ করা আইভরি আর গণ্ডারের শিং দিয়ে বানানো, শ্যাফট-এর মাথাটাকে খুদে একটা হাতির আকৃতি দেয়া হয়েছে। ছড়িটা দেখতে একজন ফিল্ড মার্শালের ব্যাটন-এর মত। কর্নেল ছিলেন, ক্ষমতা দখল করে জেনারেল হয়েছেন, হয়তো আবার নিজেকে প্রমোশন দেয়ার ইচ্ছে রাখেন।

এই মুহূর্তে ছড়িটা তাঁর সামনে টেবিলের ওপর রাখা মডেলের বিভিন্ন বস্তু চিহ্নিত করার কাজে ব্যবহার করলেন সিমন সাফারি। 'আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, বনভূমির ভেতর মাইনিং ট্র্যাক সরু একটা পথ, মাত্র ষাট গজ চওড়া। এ-কথা সত্যি যে পথটা তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে দু'পাশের আরও অনেক গাছ ও ঝোপ কেটে সাফ করে ফেলছি আমরা, মোমু যাতে সামনে এগোতে পারে।'

এক মুহূর্ত থেমে গম্ভীর হলেন সিমন সাফারি। 'এটাকে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস বলে না, বলে ফসল কেটে ঘরে তোলা। ধৈর্য ধরুন, প্লীজ, ব্যাপারটা আমি ব্যাখ্যা করছি।

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ বলে গেলেন সিমন সাফারি। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হলো–

সব মিলিয়ে একশো গজ চওড়া হচ্ছে পথটা, লম্বা হবে অনেক মাইল। এতে করে দেশের মোট বনভূমির শতকরা মাত্র এক ভাগ বা তারও কম আক্রান্ত হচ্ছে।

মোমু ট্রেঞ্চ কেটে এগোচ্ছে, তার পিছু পিছু আসছে এক ঝাঁক বুলডোজার–ওগুলো মাটি দিয়ে দ্রুত ভরে ফেলছে ট্রেঞ্চগুলোকে। মাটির যাতে অপচয় না ঘটে বা ধসে না পড়ে, সেদিকে গুরুত্ব থাকায় ট্রেঞ্চ কাটা হচ্ছে জমিনের স্বাভাবিক ঢাল বা ঢিবিগুলোকে এড়িয়ে। পথটা আঁকাবাঁকা হবার সেটাই কারণ। ট্রেঞ্চগুলো মাটি দিয়ে ভরাট হওয়া মাত্র কচি চারা আর বীজ রোপণ করা হচ্ছে। ওগুলোর কোনটা দ্রুত বেড়ে উঠবে, কাজ করবে জমিনের আচ্ছাদন হিসেবে। বাকিগুলো বাড়বে ধীর গতিতে, তবে আজ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে প্রতিটি বিশাল বৃক্ষে পরিণত হবে, হয়ে উঠবে আবার নিধনযোগ্য। 'তখন তা দেখার জন্যে আমি থাকব না, তবে আমার নাতি-নাতনীরা থাকবে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'এই অপারেশনের প্ল্যান এমনভাবেই করা হয়েছে, প্রতি বছর কোনভাবেই বনভূমির শতকরা এক ভাগের বেশি গাছ কাটা হবে না। এটা বোঝার জন্যে অঙ্ক শাস্ত্রে পণ্ডিত হবার দরকার নেই যে কাজটা শেষ করতে দু'হাজার নব্বুই সাল এসে যাবে। ওই সময়ের মধ্যে আজ উনিশশো নব্বুই সালে আমরা যে গাছ লাগাচ্ছি, ওগুলো হবে একশো বছরের পুরানো। তারমানে গাছ কাটার কাজ আবার নতুন করে শুরু করতে পারব আমরা।' ক্যামেরার লেন্সে সরাসরি তাকিয়ে বিজয়ের হাসি হাসলেন সিমন সাফারি। 'আজ থেকে এক হাজার বছর পরও উবোমোর বনভূমি অনাগত প্রজন্মের জন্যে এখনকার মত এতটাই বড় থাকবে, আজ যেমন বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর জন্যে স্বর্গ হয়ে আছে আমাদের এই অরণ্য, সেদিনও তাই থাকবে।'

ভদ্রলোকের কথার মধ্যে যুক্তি আছে, মনে মনে স্বীকার করতে হলো রানাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে এরকমটি ঘটতেও দেখেছে ও। বন কেটে সরু একটা পথ তৈরি করলে কোন প্রজাতির অস্তিত্ব গুরুতর সংকটের মুখে পড়বে বলে মনে হয় না। সিমন সাফারি যে দর্শন বা ধারণার কথা বলছেন, ও নিজেও সেটা বিশ্বাস করে–প্রাকৃতিক সম্পদকে সুশৃঙ্খল ও পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানো উচিত, যাতে প্রকৃতিই আবার দ্রুত ক্ষতিপূরণ করে দেয়।

সিমন সাফারির প্রতি ওর মনে যে বিরূপ ধারণাটা ছিল, আপাতত সেটা নিস্তেজ হয়ে পড়ল। হাসিমুখে বলল ও, 'মি. প্রেসিডেন্ট, আপনার পারফরম্যান্স সত্যি দারুণ হয়েছে। ধন্যবাদ।'

দুই

ল্যাণ্ডরোভারের টেইলবোর্ড-এ বসে রয়েছে চাখার সিং, উরুর ওপর রেখে কাগজটা সমান করল। সে তার বাম হাত দিয়ে ডান হাতের কাজ করায় দক্ষ হয়ে উঠেছে। 'কাগজের টুকরোটা আমার সমস্ত আনন্দ কেড়ে নিল,' মন্তব্য করল সে।

'কাগজটা আনন্দদানের জন্যে তৈরি করা হয়নি,' গম্ভীর সুরে বললেন চঙমঙ গঙ। 'ওটা আমার বাবাকে সম্মান দেখিয়ে উপহার হিসেবে দেয়া হয়েছে।

এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে কাজ হয়।'

চোখ তুলে হাসল চাখার সিং, চেষ্টা করা সত্ত্বেও হাসিটায় আন্তরিকতার অভাব থেকে গেল। তাইপে থেকে আসার পর চঙমঙ গঙকে অন্য রকম লাগছে তার। চীনা ভদ্রলোক কোত্থেকে যেন নতুন একটা শক্তি পেয়েছেন, আচরণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ একটা ভাব এসে গেছে, বেড়ে গেছে আত্মবিশ্বাস। এর আগে এগুলো তাঁর মধ্যে এই পরিমাণে ছিল না। এ-সব লক্ষণ ভাল ঠেকছে না চাখার সিং-এর। এই প্রথম উপলব্ধি করল সে, চঙমঙ গঙকে ভয় করে সে। অনুভূতিটা অস্বস্তিকর।

'তবু, আনন্দ থাকলে কাজ ভাল হয়,' নিজের পক্ষে যুক্তি দেখাল চাখার সিং, তবে চঙমঙ গঙের কঠিন দৃষ্টি অনুভব করে মুখ তুলে তাকাতে পারল না। চোখ নামিয়ে কাগজটা আরেকবার পড়ল।

প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি তাঁর অফিশিয়াল প্যাডে চিঠিটা লিখেছেন। কাগজের মাথায় লেখা রয়েছে–'পিপলস ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অভ উবোমো'।

চিঠিটা তর্জমা করলে এরকম দাঁড়ায়:

'এই চিঠির বাহক মি. চঙমঙ গঙকে, কিংবা তাঁর অনুমোদিত এজেন্টকে, প্রেসিডেন্টের বিশেষ ক্ষমতাবলে উবোমোর যে-কোন স্থানে নিম্নে উল্লেখিত প্রাণী শিকার করার বা ফাঁদ পেতে ধরার অবাধ অধিকার দেয়া গেল। যেমন–হাতির পাঁচটা নমুনা।

'বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনে উক্ত নমুনা সংগ্রহ করে নিজের কাছে রাখার, বিক্রি করার, বিদেশে রফতানি করার অধিকারও তাঁর থাকল। নমুনা বলতে শুধু জীবিত হাতি বোঝাবে না; বোঝাবে হাতির চামড়া, হাড়, মাংস ও আইভরি।'

নিচে সই করেছেন প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি।

লাইসেন্সটা তাড়াহুড়ো করে দেয়া হয়েছে। চঙমঙ গঙের অনুরোধে নিজের প্যাডেই লিখে দিয়েছেন সিমন সাফারি, তারপর সিল-ছাপ্পড় মারা হয়েছে।

'আমি একজন পোচার,' নিজের ক্ষোভের কারণটা ব্যাখ্যা করল চাখার সিং। 'আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ পোচার। কিন্তু এই কাগজের টুকরোটা সামান্য একজন এজেন্টে পরিণত করেছে আমাকে, পরিণত করেছে কসাইয়ের সহকারীতে···।'

ধৈর্য হারিয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন চঙমঙ গঙ। শিখ লোকটা তাঁকে বড় জ্বালাতন করছে। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত রয়েছে তাঁর মাথা। ভেবে দেখার সময় কোথায় কার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগল কি লাগল না। গাছ কেটে পরিষ্কার করা জায়গাটায় পায়চারি শুরু করলেন তিনি, চিন্তায় মগ্ন। মাটি নরম কাদা হয়ে আছে, পায়ের নিচে ডেবে যাচ্ছে। বাতাসে স্যাঁতসেঁতে ভাব, ঝাপসা করে তুলছে তাঁর সানগ্লাসের লেন্স। ওগুলো খুলে ওপেন নেক শার্টের ব্রেস্ট পকেটে রেখে দিলেন। ফাঁকা জায়গাটার চারদিকে নিরেট পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছপালা। তীক্ষ্ণ চোখ বুলালেন তিনি। বনভূমি তাঁর কাছে চিরকালই রহস্যময় আর অশুভ। ভয় ভয় ভাবটা গোপন করার জন্যে চোখের সামনে হাত-

ঘড়িটা তুললেন তিনি। 'তার আসার সময় পেরিয়ে গেছে। কখন আসবে সে?' প্রায় ধমকের সুরে জানতে চাইলেন।

কাঁধ ঝাঁকাল চাখার সিং, এক হাতে ভাঁজ করল গেইম লাইসেন্সটা। 'তার সময়জ্ঞান আমাদের মত নয়। সে একজন পিগমি। তার সুবিধেমত আসবে সে। এমন হতে পারে হয়তো অনেক আগেই পৌঁচেছে, আড়াল থেকে নজর রাখছে আমাদের ওপর। কিংবা হয়তো কাল আসবে, অথবা পরশু।'

'কিন্তু আমি তো আর সময় নষ্ট করতে পারি না,' চঙমঙ গঙের গলায় ঝাঁঝ। 'আমার আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে আছে।'

'আপনার মহান পিতার উপহার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত আমার সেরকমই ধারণা হয়েছে,' বলে আবার হাসল চাখার সিং, এবার তার হাসিতে সামান্য হলেও ব্যঙ্গ থাকল।

'এই শালার আফ্রিকার কালো বর্বরগুলো জাহান্নামে যাক!' আবার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন চঙমঙ গঙ। 'ওদের কথার কোন দাম নেই। এক বিন্দু বিশ্বাস করা যায় না।'

'ওরা আসলে বাঁদর,' সায় দিল চাখার সিং, 'তবে উপকারী বাঁদর।'

ফাঁকা জায়গাটার শেষ মাথা পর্যন্ত হেঁটে যেতে সাহস হলো না, তাড়াতাড়ি ফিরে এসে চাখার সিং-এর সামনে দাঁড়ালেন চঙমঙ গঙ। 'রানার ব্যাপারটা কি হবে? কিছু ভেবেছেন? ওর একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে।'

'ও, হ্যাঁ।' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে শব্দহীন হাসল চাখার সিং। 'ওই কাজটায় আনন্দ আছে, সত্যি বলছি।' হারানো হাতের গোড়াটা বাঁ হাত দিয়ে ডলল সে। 'প্রায় এক বছর ধরে প্রতি রাতে মাসুদ রানাকে স্বপ্ন দেখি আমি। অথচ একবারও ভাবিনি যে ভগবান তাঁকে সেঙ্গি সেঙ্গিতে আমার সামনে এভাবে পরিবেশন করবেন। ডানা কাটা একটা পাখির মত, নেভার মাইণ্ড।'

'লোকটা এখানে থাকতেই তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে,' নির্দেশের সুরে বললেন চঙমঙ গঙ। 'এই জায়গা ছেড়ে জীবিত যেন পালাতে না পারে।'

'এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি কোনরকম মাথা ঘামাবেন না,' বলল চাখার সিং। 'এ-ব্যাপারে আমি আমার সমস্ত মেধা নিয়ে গবেষণা করছি। ভালমানুষ মাসুদ রানার প্রস্থানটা হবে একাধারে দৃষ্টান্তমূলক এবং ব্যথাবহুল, আবার একই সঙ্গে দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্য হিসেবে ব্যাখ্যা দেয়ার উপযোগী।'

'আমি চাই না খুব বেশি সময় নেন আপনি,' সতর্ক করলেন চঙমঙ গঙ।

'আমার হাতে পাঁচদিন সময় আছে,' শান্ত গলায় বলল চাখার সিং। 'ছবির শিডিউল দেখেছি। পাঁচদিনের আগে সেঙ্গি সেঙ্গির কাজ শেষ করতে পারবেন না মাসুদ রানা···।'

'আর তার সহকারিণী মেয়েটার কি হবে?' বাধা দিয়ে জানতে চাইলেন চীনা ধনকুবের।

'আপাতত তাকে নিয়ে প্রেসিডেন্ট সাফারি সামান্য মৌজ-ফূর্তি করছেন, তবে আমি মনে করি সর্বশেষ দীর্ঘযাত্রায় তাকেও মাসুদ রানার সঙ্গিনী হিসেবে রাখা

দরকার...,' হঠাৎ থেমে ল্যাণ্ডরোভারের টেইলগেট থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল চাখার সিং।

নিবিড় বনভূমির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে সে। চঙমঙ গঙ কথা বলতে যাচ্ছেন দেখে ইঙ্গিতে চুপ থাকতে বলল তাঁকে। ঝাড়া প্রায় এক মিনিট মাথাটা একদিকে কাত করে কি যেন শোনার চেষ্টা করল সে। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আমার ধারণা, সে এসেছে।'

'কিভাবে বুঝলেন?' নিজের অজান্তেই নিচু গলায় কথা বলছেন চঙমঙ গঙ, বনভূমির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালেন।

'কান পাতুন,' বলল চাখার সিং। 'পাখিরা।'

'আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।'

'ঠিক তাই, কোন শব্দ হচ্ছে না,' মুচকি হেসে বলল চাখার সিং। 'পাখিরা চুপ মেরে গেছে।' সবুজ পাঁচিলের দিকে এগোল সে, গলা চড়িয়ে সোয়াহিলি ভাষায় বলল, 'তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, অরণ্যের সন্তান। সামনে বেরিয়ে এসো, আমরা যাতে পরস্পরকে বন্ধু হিসেবে অভ্যর্থনা জানাতে পারি।'

আলোর রহস্যময় কারসাজির মত গাছপালার প্রায় নিরেট পাঁচিলের একটা ফাঁকে উদয় হলো পিগমি লোকটা। চকচকে সবুজ পাতা দিয়ে তার প্রায় পুরোটা শরীরই ঢাকা, ফাঁকা জায়গাটাকে ঘিরে থাকা গাছগুলোর মগডাল ছুঁয়ে নেমে আসা রোদ লেগেছে তার ফোলা পেশীগুলোয়। তার চামড়াকে কালো আলো বলা যায়। মানুষটা অত্যন্ত ছোট, কিন্তু একবার চোখ বুলালেই বোঝা যায় গায়ে প্রচণ্ড শক্তি রাখে। শরীরের তুলনায় মাথাটা যেন আরও ছোট, তবে সুগঠিত ও পরিচ্ছন্ন। নাকটা চওড়া ও চ্যাপ্টা, মুখে ছাগলদাড়ি।

'আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, মহান শিকারি ওজি হাবিব,' বলল চাখার সিং।

সাবলীল ভঙ্গিতে ফাঁকা জায়গাটায় বেরিয়ে এল খর্বকায় মানুষটা। 'তামাক এনেছেন আমার জন্যে?' সোয়াহিলি ভাষায় জানতে চাইল সে, বাচ্চা ছেলের মত সরাসরি।

হেসে উঠে তামাক ভরা একটা কৌটা বের করল চাখার সিং, বাড়িয়ে ধরল তার দিকে।

কৌটার মুখটা খুলল ওজি হাবিব। দু'আঙুলে খানিকটা তামাক নিয়ে মুখের ভেতর ভরল, গুজে রাখল ওপরের ঠোঁটের ভেতর। আনন্দে হেসে উঠল সে।

'আমি ভেবেছিলাম আরও ছোটখাট হবে লোকটা,' মন্তব্য করলেন চঙমঙ গঙ। 'গায়ের রঙটাও যেন কেমন!'

'ও বোধহয় ঠিক পুরোপুরি বামবুটি নয়,' ব্যাখ্যা করল চাখার সিং। 'ওর বাপ হিটা। হিটারা সাধারণত খ্রিস্টান হয়। ওর বাপ ওর মাকে বিয়ে করার জন্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। অন্তত এরকমই শুনেছি আমি।'

'শিকারি হিসেবে ভাল?' জানতে চাইলেন চঙমঙ গঙ, গলায় সন্দেহ। 'হাতি শিকার করতে পারবে?'

হেসে উঠল চাখার সিং। 'ওর গোত্রের সবচেয়ে নামকরা শিকারী ও। তবে

সেটা কথা নয়। কথা হলো, ওর আরও অনেক গুণ আছে–উহালি রক্ত থেকে পায়নি, পেয়েছে হিটা রক্ত থেকে।'

'কি সেগুলো?' জিজ্ঞেস করলেন চঙমঙ গঙ।

'টাকার কি মূল্য বোঝে সে,' ব্যাখ্যা দিল চাখার সিং। 'বামবুটিদের কাছে টাকা বা সম্পত্তির কোন গুরুত্ব নেই, কিন্তু ওজি হাবিবের ব্যাপারটা আলাদা। লোভী হবার মত যথেষ্ট সভ্য সে।'

ওদের কথা শুধু শুনে যাচ্ছে ওজি হাবিব। ইংরেজি বোঝে না, যখন যে কথা বলছে তার দিকেই মাথা ঘুরিয়ে আপনমনে তামাক চিবাচ্ছে। পশুর ছোট্ট এক টুকরো চামড়ায় তার শুধু উরুসন্ধি ঢাকা পড়েছে, পরনে আর কিছু নেই–তবে সারা শরীর শুকনো সরু লতা দিয়ে প্যাঁচানো, সবুজ পাতাগুলো সেই লতার সঙ্গে আটকে নিয়েছে। কোমরে একটা ম্যাচেটি, ধনুকটা কাঁধ ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে রয়েছে পিছনে। হঠাৎ করেই ওদের আলোচনায় বাধা দিল সে। 'আপনার সঙ্গে ওই লোকটা কে?'

'উনি একজন নামকরা সর্দার। প্রচুর টাকার মানুষ,' আশ্বস্ত করল চাখার সিং।

হাতের পেশী ফুলিয়ে দেখাল ওজি হাবিব, খাটো পায়ে এক চক্কর নাচল, বলল, 'নামকরা সর্দারের কাজ করতে ভালবাসি আমি। আমি টাকা ভালবাসি।' তারপর মুখ তুলে চঙমঙ গঙের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকল সে।

'গায়ের রঙ দেখে মনে হয় ওর ম্যালেরিয়া হয়েছে,' মন্তব্য করলেন চীনা ব্যবসায়ী। 'চোখ দুটো সাপের মত।'

না বুঝলেও, খিকখিক করে হাসল ওজি হাবিব, থুতু ফেলল পায়ের সামনে।

'লোভী হলেও, লোকটা সভ্য মানুষদের সম্মান করতে শেখেনি।'

'বামবুটিরা এরকমই,' চঙমঙ গঙকে ঠাণ্ডা করতে চাইল চাখার সিং। 'ছেলেমানুষদের মত, যেটা ভাল লাগে চিন্তা-ভাবনা না করে সেটাই করে বসে।'

'ওকে আপনি হাতির কথা জিজ্ঞেস করুন,' নির্দেশ দিলেন চঙমঙ গঙ।

ওজি হাবিবের দিকে ফিরে প্রশ্রয়ের হাসি হাসল চাখার সিং। 'ওজি হাবিব, আমি এসেছি তোমার মুখে হাতির খবর জানতে,' বলল সে।

খসখস করে উরুসন্ধি চুলকাল ওজি হাবিব। 'হাতি সম্পর্কে কি জানি আমি?'

'বামবুটিদের মধ্যে তুমিই সেরা শিকারি,' প্রশংসার সুরে বলল চাখার সিং। 'ওজি হাবিবের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বনভূমিতে কিছুই নড়ে না।'

'সে-কথা অবশ্য সত্যি,' স্বীকার করল ওজি হাবিব, এখনও কৌতূহলী চোখে চঙমঙ গঙকে দেখছে সে। 'নামকরা সর্দার, প্রচুর টাকা, কেমন? তাহলে বলেই ফেলি–সর্দারের হাতে ওই ব্রেসলেটটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে,' বলল সে। 'হাতি নিয়ে আলোচনা শুরুর আগে সর্দারের উচিত ওটা আমাকে উপহার হিসেবে দান করা।'

'ওজি আপনার হাতঘড়িটা চায়,' চঙমঙ গঙকে বলল চাখার সিং।

'বুঝতে পেরেছি!' খেঁকিয়ে উঠলেন চঙমঙ গঙ। 'লোকটা বেয়াদপ! ওর মত বাঁদর একটা গোল্ড রোলেক্স নিয়ে কি করবে?'

'সম্ভবত পানির দামে কোন ট্রাক-ড্রাইভারের কাছে বেচে দেবে,' জবাব দি

চাখার সিং, চীনা বন্ধুর রাগ আর হতাশা উপভোগ করছে সে।

'ওকে জানিয়ে দিন, আমাকে ব্ল্যাকমেইল করা যাবে না। এটা আমার শখের জিনিস, দেয়া সম্ভব নয়।'

কাঁধ ঝাঁকাল চাখার সিং। 'আপনি যা ভাল মনে করেন। কিন্তু এর মানে হবে, বাবাকে আপনি উপহারটা পাঠাতে পারবেন না।'

রেগেমেগে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন চঙমঙ গঙ। লাল হয়ে উঠেছে তাঁর চেহারা। গোল্ড ব্রেসলেটটা কব্জি থেকে খুলে পিগমির বাড়ানো হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি।

ঘড়িটা দু'হাতে ধরে উল্টেপাল্টে দেখছে ওজি হাবিব, ডায়ালের চারদিকে বসানো হীরার টুকরোগুলো দ্যুতি ছড়াচ্ছে তার চোখে। 'সুন্দর জিনিস,' বলল সে। 'এত সুন্দর যে হঠাৎ করে আমার হাতির কথা সব মনে পড়ে যাচ্ছে।'

'তাহলে বলো আমাদের,' তাগাদা দিল চাখার সিং।

'গোনডালার কাছাকাছি ত্রিশটা বাচ্চা আর মাদী হাতি আছে,' বলল ওজি হাবিব। 'ওই পালেই আছে দুটো মদ্দা। তাদের আছে সাদা আর লম্বা দাঁত।'

'কত লম্বা?' জিজ্ঞেস করল চাখার সিং, আগ্রহের সঙ্গে ওদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন চঙমঙ গঙ।

'একটা হাতি অপরটার চেয়ে আকারে বড়। তার দাঁতগুলো এরকম লম্বা,' বলল ওজি হাবিব, কাঁধ থেকে ধনুক তুলে মাথার ওপর উঁচু করল, দাঁড়াল পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে। 'এতটা লম্বা,' আবার বলল সে। 'আমার ধনুক যতদূর নাগাল পায়–দাঁতের গোড়া থেকে ঠোঁট পর্যন্ত, তবে খুলির ভেতর লুকিয়ে থাকা অংশটা বাদে।'

'মোটা কি রকম?' ভাঙা ভাঙা সোয়াহিলিতে জানতে চাইলেন সাবেক রাষ্ট্রদূত, লোভে বেসুরো হয়ে উঠল তাঁর গলার আওয়াজ।

তাঁর দিকে ফিরল ওজি হাবিব, তাঁকে ঘিরে ঘুরে এল এক চক্কর। খাটো হাত দিয়ে নিজের কোমরে একটা অর্ধবৃত্ত আঁকল সে। 'এরকম মোটা,' বলল সে। 'আমার মত মোটা।'

'তারমানে ওটা বিশাল একটা হাতি,' অবিশ্বাসে বিড়বিড় করল চাখার সিং।

রাগের ভান করে পিছিয়ে গেল ওজি হাবিব, তারপর মারমুখো হয়ে ছুটে এসে আবার নিজের জায়গায় থামল। 'সব হাতির রাজা সে। আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমার কথা যে অবিশ্বাস করে, আমি তার পায়ে বসে হাগি। আমি, ওজি হাবিব বলছি, সব হাতির সেরা হাতি সেটা।'

'ঠিক আছে, তোমাকে আর পা নোংরা করতে হবে না, বিশ্বাস করলাম তোমার কথা,' বলল চাখার সিং। 'আমি চাই ওই হাতিটা মারো তুমি, মেরে তার শিংগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো।'

মাথা নাড়ল ওজি হাবিব। 'এই হাতি এখন গোনডালায় নেই। জঙ্গলে লোহার হলুদ মেশিন আসার পর ধোঁয়া আর শব্দে ভয় পেয়ে যায় সে। পালিয়ে গেছে।'

'পালিয়ে যদি যায়ও, তুমি তাকে ঠিকই খুঁজে বের করতে পারবে,' বলল চাখার সিং। 'তুমি হলে ওস্তাদ শিকারী। তা কোথায় পালিয়েছে হাতিটা?'

'চলে গেছে পবিত্র মধ্যভূমিতে, যেখানে কোন মানুষ শিকার করবে না। জনক ও জননীর নিষেধ আছে। মধ্যভূমিতে এই হাতিকে মারা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

'হাতিটার দাঁত আমার খুবই দরকার,' বলল চাখার সিং। 'বিনিময়ে অনেক কিছু দিতে পারি।' লোভ দেখাল সে।

কথা না বলে মাথা নাড়ল ওজি হাবিব।

'বলুন এক হাজার ডলার দেয়া হবে,' ইংরেজিতে বললেন চঙমঙ গঙ।

তাঁর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল চাখার সিং। 'ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন,' সাবধান করল সে। 'ব্যস্ততা দেখালে সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাবে।' ওজি হাবিবের দিকে ফিরল আবার। সোয়াহিলি ভাষায় বলল, 'মেয়েমানুষরা রঙচঙে কাপড় ভালবাসে। তাদের মন জয় করতে হলে কাঁচের পুঁতিও দরকার। আমি তোমাকে দশ থান রঙিন কাপড় দেব। আরও দেব পঞ্চাশ মুঠো কাচের পুঁতি–এক-হাজার কুমারীকে পটাবার জন্যে যথেষ্ট।'

আগের মতই মাথা নাড়ল ওজি হাবিব। 'জঙ্গলের মধ্যভূমি অত্যন্ত পবিত্র,' বলল সে। 'ওখানে আমি শিকার করলে জনক ও জননী আমার ওপর রাগ করবে।'

'কাপড় আর পুঁতি ছাড়াও তোমাকে আমি দশটা কোদাল আর দশটা ছোরা দেব, ছোরাগুলোর পাত হবে তোমার হাতের মত লম্বা।'

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সারা শরীর ঝাঁকাল ওজি হাবিব, যেন ভিজে বিড়াল গা থেকে পানি ঝরাচ্ছে। 'আইনে মানা আছে। নিষেধ আছে গোত্রের। আমার গোত্র আমাকে ঘৃণা করবে। আমাকে তাড়িয়ে দেবে।'

'আরও পাবে দশ বোতল জিন,' বলল চাখার সিং। 'সঙ্গে থাকবে তামাক, যতটা তুমি দু'হাত ধরে তুলতে পারো।'

আবার উরু সন্ধি চুলকাল ওজি হাবিব। 'কি বললেন? আবার বলুন। যতটা তামাক আমি দু'হাতে তুলতে পারি?' লোভে ও উত্তেজনায় তার গলা বেসুরো শোনাল। 'এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব না। ওরা মোলিমোকে ডাকবে। জনক আর জননীর অভিশাপ লাগবে আমাকে।'

'তাছাড়াও আমি তোমাকে একশোটা রুপোর মারিয়া থেরেসা ডলার দেব,' বুশ জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে এক মুঠো খুচরো পয়সা বের করল চাখার সিং। দু'হাতে নাড়াচাড়া করল ওগুলো, ঝন ঝন শব্দ উঠল।

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল ওজি হাবিব। তারপর হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে লাফ দিল সে, কোমর থেকে এক টানে বের করল ম্যাচেটিটা। আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল চাখার সিং ও চঙমঙ গঙ। তবে না, ওদের আক্রমণ করল না। সবেগে ঘুরল সে, মাথার ওপর ম্যাচেটি তুলে ছুটল বনভূমির পাঁচিল লক্ষ্য করে। প্রথম ঝোপটায় কোপ মারল সে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল পাতা আর কচি ডাল। একের পর এক, ঘন ঘন ম্যাচেটির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কয়েকটা ঝোপ। তারপর এক সময় শান্ত হলো ওজি হাবিব, ম্যাচেটির ওপর ভর দিয়ে হাঁপাচ্ছে, ঘন ঘন উঁচু-নিচু হচ্ছে চওড়া বুক, ঘামের ধারাগুলো ভিজিয়ে দিচ্ছে তার দাড়ি। ফোঁপাতে শুরু করল সে, ক্লান্তি ও আত্মধিক্কারে।

একসময় সিধে হলো, আগের জায়গায় ফিরে এসে চাখার সিংকে বলল, 'আপনার জন্যে এই হাতিটাকে মারব আমি, তার দাঁত এনে দেব আপনাকে। বিনিময়ে ও-সব জিনিস আপনি আমাকে বুঝিয়ে দেবেন, যা যা দেবেন বলেছেন। কোন কারচুপি করবেন না। বিশেষ করে তামাক যেন কম না হয়।'

ফেরার পথে সাবধানে ল্যাণ্ডরোভার চালাচ্ছে চাখার সিং। প্রধান সড়কে পৌঁছুতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল তার। শ্রম শিবিরের শ্রমিকরা কাজ করছে রাস্তায়, প্রকাণ্ড আকারের ওর-ক্যারিয়ার আর লগিং ট্রাকগুলো সগর্জনে ছুটে যাচ্ছে খানিক পর পর। বাঁক ঘুরে সেঙ্গি সেঙ্গির পথ ধরল ওরা। পাশে বসা বন্ধুর দিকে ফিরে হাসল চাখার সিং। 'আপনার বাবার উপহারের ব্যবস্থা করা হলো। এবার আমার উপহারের কথা চিন্তা করা যাক।'

'আপনার উপহার?'

'মাসুদ রানার মুণ্ডু,' বলল চাখার সিং। 'তার কম কিছুতে আমি সন্তুষ্ট হব না। ওটা আমাকে পরিবেশন করতে হবে রূপোর প্লেটে। মুখে থাকতে হবে একটা পাকা আপেল।'

তিন

সুযোগটা এল হঠাৎ।

মোমুর উঁচু কমাণ্ড ডেকে রয়েছে রানা, ঝমাঝম বৃষ্টি হচ্ছে। ভেজা বাতাস নীলচে আর ভারি হয়ে রয়েছে, পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ ফুটের ওদিকে দৃষ্টি চলে না। প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় কমাণ্ড কেবিন, ভেতরে ঢুকে গা বাঁচাচ্ছে সোফিয়া, বৃষ্টি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে মূল্যবান ভিডিও ইকুইপমেন্টগুলো। দু'জন হিটা গার্ড ছিল, আপাতত তারা নিচের ডেকে নেমে গেছে। আপার ডেকে রানা একা।

অহরহ বৃষ্টিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ও। সেঙ্গি সেঙ্গিতে আসার পর দেখা যাচ্ছে প্রায় সারাক্ষণই ভিজে আছে ওর কাপড়চোপড়। এই মুহূর্তে কমাণ্ড কেবিন আর ফ্লাইং ব্রিজ-এর কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, কমাণ্ড কেবিনের ইস্পাতের দেয়াল আংশিক রক্ষা করছে ওকে বৃষ্টি থেকে। দমকা বাতাসের সঙ্গে ছুটে এসে বৃষ্টির পানি ভিজিয়ে দিচ্ছে, চোখ দুটো ওর আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ করে কমাণ্ড কেবিনের দরজা খুলে ফ্লাইং ব্রিজে বেরিয়ে এলেন চঙমঙ গণ্ড। রানাকে তিনি দেখতে পাননি, ক্যানভাস সানশেডের নিচে দিয়ে সামনে এগোলেন, দাঁড়ালেন ফরওয়ার্ড রেইলিং-এর সামনে, উঁকি দিয়ে নিচে তাকিয়ে প্রকাণ্ড একস্কেভেইটর ব্লেডগুলোর দিকে তাকালেন। সত্তর ফুট নিচে মাটি কাটছে ওগুলো।

এরকম সুযোগ শুধু ভাগ্যগুণে পাওয়া যায়। এই প্রথম অপরাধী মি. গণ্ডকে

একা পেয়েছে ও। এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ অসহায় তিনি।

'তোমাকে মারছি আলির বদলে,' আপনমনে বলল রানা, এগোবার সময় রাবার সোল থেকে কোন শব্দ হলো না। ব্রিজের স্টীল প্লেট পিচ্ছিল হয়ে আছে ভিজে, খুব সাবধানে পা ফেলছে ও। চঙমঙ গণ্ডের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল।

রানাকে এখন শুধু ঝুঁকে মি. গণ্ডের গোড়ালি দুটো ধরতে হবে। ঝট করে ওপর দিকে তুলে ঠেলে দিতে হবে সামনের দিকে। রেইলিং টপকে নিচে পড়বেন ভদ্রলোক, পড়বেন ব্লেডগুলোর ওপর। মৃত্যু হবে তাৎক্ষণিক। চোখের পলকে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে তাঁর গোটা শরীর, মাংসের টুকরোগুলো ঢুকে যাবে টিউব মিলে, লোহার বলগুলো পিষে ওগুলোকে মণ্ড তৈরি করবে, মিশিয়ে দেবে কয়েক শো টন মিহি পাউডারের মত মাটির সঙ্গে।

আরও এক পা এগিয়ে হাত বাড়াল রানা ধরার জন্যে। নিজের অজান্তেই ইতস্তত করল এক সেকেণ্ড, যেন হঠাৎ নিজের কাপুরুষতা উপলব্ধি করে হতভম্ব হয়ে গেছে। এটা তো স্রেফ ঠাণ্ডা মাথায় খুন। এর আগেও ওর হাতে অনেক মানুষ মারা গেছে, তবে এভাবে নয়। নিজের প্রতি অদ্ভুত এক ধিক্কার জাগল মনে। প্রতিপক্ষকে কোন সুযোগ না দিয়ে এভাবে চোরের মত আঘাত হানা কাপুরুষতা নয় তো কি!

আলি শাহের লাশটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। নিজেকে শক্ত করল রানা। না, কাজটা ওর এখুনি সেরে ফেলা দরকার। কিন্তু ইতিমধ্যে দেরি হয়ে গেছে, হঠাৎ ঝট্ করে ওর দিকে ঘুরলেন চঙমঙ গণ্ড।

এত ক্ষিপ্র মনে হলো তাঁকে, যেন সাপ দেখে রুখে দাঁড়ানো একটা বেজি। তাঁর হাত দুটো উঁচু হলো, শক্ত কঠিন আঙুলসহ ওগুলো হয়ে উঠল মার্শাল আর্ট-এর ভঙ্গি নিয়ে ইস্পাতের পাত। কালো চোখে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে।

এক মুহূর্ত পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকল ওরা, তারপর ফিসফিস করে চঙমঙ গণ্ড বললেন, 'আপনার সুযোগ আপনি হারিয়েছেন, মি. মাসুদ রানা। আর কখনও পাবেন না।'

পিছিয়ে এল রানা। কোমল হৃদয় ও বিবেক ওকে ওর পবিত্র দায়িত্ব পালনে বাধা দিয়েছে। আলি শাহের কাছে যেন ছোট হয়ে গেল ও। কোমল হৃদয় বা বিবেক, এ-সব তো এক ধরনের দুর্বলতা, ওর পেশায় একেবারেই অচল। অথচ ওর বেলায় এরকম প্রায়ই ঘটে। মানুষ নামের অযোগ্য নিষ্ঠুর পিশাচদের শায়েস্তা করার সময়ও মানবিক গুণগুলোকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারে না। একদিন হয়তো ওর এই দুর্বলতার কারণেই চরম মূল্য দিতে হবে ওকে। চোখ-কান বুজে চীনা ক্রিমিন্যালকে খুন করা উচিত ছিল ওর। এখন আর তা সম্ভব নয়, সতর্ক হয়ে গেছে শত্রু। এই ঘটনার ফলে আগের চেয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

পিছিয়ে এসে ঘুরল রানা, তারপরই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হিটা গার্ডদের একজন চিতার মত নিঃশব্দে মই বেয়ে উঠে এসেছে ওপরে। ব্রিজের শেষ মাথার রেইলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, মেরুন রঙের বেরেট নেমে এসেছে একটা চোখের ওপর, কোমরের কাছে ধরা উজি সাবমেশিন গান রানার পেটে তাক করা। গোটা ব্যাপারটা চুপচাপ দেখছিল সে।

সেদিন গভীর রাত পর্যন্ত ঘুম এল না রানার। সন্দেহ নেই, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে ও আজ। দৃশ্যটা মন থেকে মুছতে পারছে না, নার্ভাস লাগছে নিজেকে। আরও একটা কথা ভেবে অসুস্থ বোধ করল ও—চঙমঙ গঙের প্রতি ওর সীমাহীন আক্রোশ। ভদ্রবেশী শয়তানটার ওপর ওর ঘৃণা আর রাগ এত বেশি যে তাকে একা ও অসহায় দেখে অন্যায় সুযোগ নেয়ার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিল।

বিবেক বাধা দিলেও, প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছাটা এতটুকু দুর্বল হয়নি ওর মনে। ভোরে ঘুম ভাঙার পর চঙমঙ গঙের প্রতি আগের মতই ঘৃণা আর আক্রোশ অনুভব করল ও। শুধু মেজাজটা খিঁচড়ে আছে, নার্ভাস লাগছে খানিকটা।

বোধহয় সে-কারণেই সোফিয়ার সাথে একচোট হয়ে গেল ওর। দিনের কাজ শুরু করতে দেরি করে ফেলল মেয়েটা, রানাকে প্রায় চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করিয়ে রাখল সে।

'তোমাকে ভোর পাঁচটার কথা বলেছিলাম, বিকেল পাঁচটার কথা নয়,' সোফিয়াকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠল রানা।

মহা আনন্দে আছে সোফিয়া, রানার রাগ তাকে প্রথমে স্পর্শই করল না। হাসিতে উদ্ভাসিত লাল গোলাপ হয়ে আছে মেয়েটা। 'প্রভু, কি করতে বলেন আমাকে আপনি, হারা-কিরি?'

'জানতে পারি, এভাবে আমাকে দেরি করিয়ে দেয়ার কি কারণ?' কঠিন সুরে জানতে চাইল রানা।

'মনে হচ্ছে তুমি আমার ওপর রেগে আছো,' এখনও হাসছে সোফিয়া। 'আমি একটা মেয়ে, তা-ও আবার তরুণী ও যৌবনবতী, সকালে সামান্য দেরি করে ঘুম তো ভাঙতেই পারে।'

'এরকম অশ্লীল কথা বলতে তোমার লজ্জা লাগে না?'

'ব্যাপারটা কি বলো তো, রানা?' বাঁকা হাসি ফুটল সোফিয়ার ঠোঁটে। 'তুমি মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইছ? ঈর্ষাকাতর, বন্ধু?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'এখন পস্তালে আর লাভ কি! এ-কথা বলতে পারবে না যে তোমাকে আমি সাধিনি। আর হ্যাঁ, ভাল কথা, আমার সঙ্গে আরও ভদ্রভাবে কথা বলতে হবে তোমাকে, রানা। তোমার প্রতি দুর্বলতা থাকায় আমি হয়তো মাইণ্ড করব না, কিন্তু আমার ভক্তরা ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে না-ও নিতে পারেন!'

এভাবে প্রচ্ছন্ন হুমকি দেবে সোফিয়া, ভাবতে পারেনি রানা। মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল ওর। কঠিন সুরে কিছু বলতে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। হঠাৎ চিন্তা করল, সোফিয়া সম্ভবত গোসল না করে সরাসরি সিমন সাফারির বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে। সন্দেহ হবার কারণ, মেয়েটার গা থেকে বেরুনো গন্ধটা। ইচ্ছে হলো কষে একটা চড় কশিয়ে দেয় সোফিয়ার গালে। তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াল ও, নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

সারাটা সকাল গম্ভীর হয়ে থাকল ও। ওর মেজাজ বুঝতে পেরে সোফিয়াও আর ওকে ঘাঁটাল না। মোমুর পথ তৈরি করার জন্যে বুলডোজার আর চেইন স' কাজ করছে, দৃশ্যটার ছবি তুলল ওরা। বৃষ্টি আর কাদার মধ্যে অত্যন্ত বিরক্তিকর ও কষ্টসাধ্য কাজ। বিপজ্জনকও বটে, চারদিকে একের পর এক ধরাশায়ী হচ্ছে

আকাশ ছোঁয়া গাছগুলো। এ-সব মেজাজ ভাল করতে কোন সাহায্য করল না, তবু জিভটাকে সামলে রাখল রানা। কিন্তু দুপুরের দিকে আবার বিস্ফোরিত হলো।

সোফিয়া হঠাৎ করে বলল, তার টেপ শেষ হয়ে গেছে, কাজ আপাতত বন্ধ রাখতে হবে। মেইন ক্যাম্পে ফিরে যেতে চায় সে, কোল্ড রুম থেকে টেপ আনতে হবে।

'কি রকম ক্যামেরা অপারেটর তুমি, শ্যুটিঙের মাঝখানে টেপ শেষ হয়ে যায়!' কঠিন সুরে জানতে চাইল রানা। 'তোমাকে নিয়ে এসে আমি দেখছি ভুলই করেছি।'

কোমরে হাত দিয়ে ওর মুখোমুখি হলো সোফিয়া। 'আমার ধারণাই ঠিক, রানা। ফিল্ম শেষ হয়ে গেছে, সেটা কারণ নয়। কারণ হলো বঞ্চনা। সুস্বাদু ফ্রুটকেক তোমার কপালে জুটছে না। সিমন সাফারি ওই জিনিস প্রচুর পরিমাণে পাচ্ছেন, সেজন্যে তুমি আমাকে সহ্য করতে পারছ না। এ সেই একচোখো দানব—ঈর্ষা!'

'চরিত্র বলে তো কিছু নেই-ই, তোমার ভেতর রুচি বলেও কিছু নেই,' হিসহিস করে উঠল রানা।

ব্যাপারটা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে চলে গেল, রানার মুখের সামনে চিৎকার জুড়ে দিল সোফিয়া। 'জীবনে কেউ আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলেনি! তোমার চাকরির আমি নিকুচি করি!' পিচ্ছিল কাদার ওপর দিয়ে ল্যাণ্ডরোভারের দিকে ছুটল সে।

'ক্যামেরাটা ল্যাণ্ডরোভারে থাকবে,' চিৎকার করে বলল রানা। 'ভিডিও ইকুইপমেন্টগুলো সবই ভাড়া করা। লণ্ডনের রিটার্ন টিকেট তোমার সঙ্গেই আছে, পাওনা টাকার একটা চেক পাঠিয়ে দেব আমি। তোমাকে বরখাস্ত করা হলো।'

'হ্যাঁ-না, লাভার বয়, তুমি আমাকে বরখাস্ত করছ না। আমি রিজাইন করছি!' ল্যাণ্ডরোভারের দরজাটা সশব্দে বন্ধ করল সোফিয়া, স্টার্ট দিল এঞ্জিনে। চারটে চাকাই উন্মত্তের মত ঘুরতে শুরু করল, পিছন দিকে বিস্তৃত হলো কাদার চাদর। তারপর রাস্তা ধরে ছুটল ল্যাণ্ডরোভার।

সাংঘাতিক অপমানিত বোধ করেছে সোফিয়া। এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে সে। অন্ধ আক্রোশে ভাবছে, প্রতিশোধটা হওয়া চাই নিষ্ঠুর। সেঙ্গি সেঙ্গির কাছাকাছি পৌঁছে কি করতে হবে বুঝতে পারল সে। আপন মনে বিড়বিড় করল, 'আমাকে অপমান করার মজাটা তুমি টের পাবে, মাসুদ রানা।' বাঁকা হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'উবোমোয় আর কোন ছবি তুলতে হবে না তোমাকে। তোমাকে বা আমার বদলে অন্য কোন ক্যামেরা অপারেটরকে সে সুযোগ দেয়া হবে না। দাঁড়াও, আমি ব্যবস্থা করছি।'

তাঁর শরীরটা লম্বা। আর এত নমনীয়, যে-কোন আকৃতি নিতে পারে। তাঁর চামড়া ধোয়া কয়লার মত চকচক করছে, প্রেম করার পর মিষ্টি ঘামে এখনও ভেজা ভেজা লাগছে। এলোমেলো সাদা চাদরে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছেন সিমন সাফারি, তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সোফিয়া। তার মনে হচ্ছে, জীবনে সম্ভবত এত

সুন্দর পুরুষ আর দেখেনি সে।

ধীরে ধীরে মাথাটা নামিয়ে তাঁর নগ্ন বুকে মুখ রাখল সোফিয়া। বুকটা মসৃণ, কোন লোম নেই। কালো চামড়া খুব ঠাণ্ডা। মুখটা বুকের ওপর ঘষল সে, ঠোঁট বুলাল। প্রেমিক হিসেবে সিমন সাফারির তুলনা পাওয়া ভার, ভাবল সে। তার সমগ্র অস্তিত্বে ভাল লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। কোন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ওর মত সুখ দিতে পারেনি তাকে। সে-ও ওকে যে ভালবাসা দিয়েছে, এরকম ভালবাসা আর কাউকে কোনদিন দিতে পারবে না। ওঁর জন্যে কিছু একটা করতে চায় সে।

'আপনাকে আমি একটা কথা বলতে চাই,' সিমন সাফারির বুকে মুখ রেখে ফিসফিস করল সোফিয়া ক্যারল।

একটা হাত বাড়িয়ে তার মুখ থেকে চুলগুলো সরালেন সিমন সাফারি। 'কি কথা?' তাঁর কণ্ঠস্বর কোমল, তবে প্রায় নির্লিপ্ত।

সোফিয়া জানে, এরপর যা বলবে সে, শুনে আঁতকে উঠবেন তার প্রেমিকপ্রবর। এই নির্লিপ্ত ভাবটা তখন আর থাকবে না। ইচ্ছে করেই কথাটা বলতে দেরি করছে সে। যতক্ষণ বলা না হয় ততক্ষণই তো উত্তেজনা আর মজা। মজাটা আসলে দু'ধরনের। কথাটা প্রকাশ করে দিয়ে রানার ওপর প্রতিশোধ নেয়া হবে, সেই সঙ্গে সিমন সাফারির কাছে প্রমাণিত করা হবে নিজের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা।

'কি কথা?' আবার জানতে চাইলেন সিমন সাফারি। সোফিয়ার চুল মুঠোয় ধরে মোচড় দিলেন, যাতে ব্যথা পায় সে। আনন্দ দান ও আনন্দ গ্রহণের উপাদান হিসেবে ব্যথাকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে জানেন। উফ্ করে উঠল সোফিয়া, শুনে ধর্ষকামীর আনন্দ অনুভব করলেন তিনি।

'আমি যে সম্পূর্ণ আপনার, এটা প্রমাণ করার জন্যে কথাটা বলছি,' ফিসফিস করছে সোফিয়া। 'আমি চাই আপনি উপলব্ধি করুন কতটা গভীর ভাবে আপনাকে আমি ভালবাসি। আজ রাতের পর আমার আনুগত্য সম্পর্কে আপনার মনে আর কোন সন্দেহ থাকবে না।'

সোফিয়ার মাথাটা এদিক ওদিক দোলালেন সিমন সাফারি, এখনও মুঠোর মধ্যে ধরে আছেন তার চুল। ব্যথা দিচ্ছেন, তবে সামান্য। 'সেটা বিচার করার ভার আমার ওপর থাক, প্রিয় গোলাপ। তোমার ভয়ংকর কথাটা শোনাও এবার।'

'ভয়ংকর তো বটেই, সিমন সাফারি। মাসুদ রানার নির্দেশে ফিশ ঈগল বে-র ঘটনাটা আমি ক্যামেরায় বন্দী করেছি।'

সিমন সাফারি হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ করলেন। সোফিয়ার কানে তাঁর হৃৎপিণ্ড বিশবার ধকধক করল, তারপর ধীরে ধীরে দম ফেললেন তিনি, পালস রেট সামান্য বাড়ল। শান্ত গলায় বললেন, 'কি নিয়ে কথা বলছ বুঝলাম না। ব্যাখ্যা করো।'

'সৈনিকরা যখন জেলেদের গ্রামে এল, আমি আর রানা পাহাড়ের মাথায় ছিলাম। রানা আমাকে ওদের ছবি তোলার নির্দেশ দেয়।'

'কি দেখলে তোমরা?'

'প্রথমে গ্রামে আগুন দিল ওরা, তারপর পুড়িয়ে দিল বোটগুলো। গ্রামের লোকদের তোলা হলো ট্রাকে। কয়েকজনকে...' ইতস্তত করে থেমে গেল সোফিয়া।

'বলো, থামলে কেন? আর কি দেখলে তোমরা?'

'আমরা দেখলাম, কয়েকজন লোককে গুলি করে মারল হিটলার সৈনিকরা। লাশগুলো ওরা আগুনে ফেলে দিল।'

'এ-সব তোমরা ক্যামেরায় ধরেছ?' জানতে চাইলেন সিমন সাফারি। তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আছে, হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল সোফিয়া। অনিশ্চিত একটা ভাব জাগল তার মনে।

'গোটা ব্যাপারটার ছবি তুলতে রানা আমাকে বাধ্য করে।'

'এ-সব ঘটনা সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না। তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি হয়, বলতে হবে মারাত্মক একটা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে—আমার কোন নির্দেশ ছাড়াই।' গম্ভীর হলেন সিমন সাফারি।

স্বস্তির একটা পরশ অনুভব করল সোফিয়া, তাঁর কথা বিশ্বাস করছে সে। 'আপনি যে কিছু জানেন না, এ আমি তখনই বুঝতে পারি।'

'ফিল্মটা আমাকে দেখতে হবে,' বললেন সিমন সাফারি। 'যারা অপরাধটা করেছে তাদের বিরুদ্ধে ওটা একটা প্রমাণ হিসেবে কাজ দেবে। ওদেরকে আমি উপযুক্ত শাস্তি দেব। ফিল্মটা কোথায়?'

'রানার কাছে।'

'কোথায় রেখেছেন তিনি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট, কর্কশ ও কঠিন শোনাল তাঁর গলা।

'আমাকে বলল, কাহালিতে রেখেছে, ব্রিটিশ দূতাবাসে।'

'ব্রিটিশ দূতাবাসে!' প্রায় আঁতকে উঠলেন সিমন সাফারি।

'রাষ্ট্রদূত স্যার মাইকেল ডাফ রানার পুরানো বন্ধু।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন সিমন সাফারি, তারপর জানতে চাইলেন, 'রাষ্ট্রদূতকে ছবিটা দেখিয়েছেন মি. রানা?'

'মনে হয় না। আমাকে শুধু বলল, জিনিসটা ডিনামাইট, সময় না হলে ওটা সে ব্যবহার করবে না।'

'তারমানে শুধু তুমি আর মি. রানা ছাড়া আর কেউ ব্যাপারটা জানে না? ফিল্মটার যে অস্তিত্ব আছে, তা-ও আর কেউ জানে না, কেমন?'

ব্যাপারটা নিয়ে এভাবে চিন্তা করেনি সোফিয়া। সিমন সাফারির কথা শুনে অস্বস্তি বোধ করল সে। 'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। যদি না রানা আর কাউকে জানিয়ে থাকে। আমি কাউকে বলিনি।'

'গুড।' সোফিয়ার চুল ছেড়ে দিয়ে তার গালে আঙুল বুলিয়ে আদর করলেন সিমন সাফারি। 'তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে। সত্যি আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। তুমি যে আমার প্রতি অনুগত, এটা প্রমাণ হয়েছে।'

'শুধু অনুগত নই, সিমন সাফারি। কোন পুরুষমানুষ এভাবে আমাকে দুর্বল করতে পারেনি। আপনার জন্যে জীবন দিতে হলেও দ্বিধা করব না। আমি

আপনাকে ভালবাসি।'

'জানি,' ফিসফিস করলেন প্রেসিডেন্ট, সোফিয়ার মাথা তুলে চুমো খেলেন ঠোঁটে। 'সত্যি তুমি দারুণ এক মেয়ে। প্রতি মুহূর্তে তোমার ওপর আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়ছি আমি। একেই বোধহয় ভালবাসা বলে।'

কৃতজ্ঞতায় তাঁর গায়ের সঙ্গে সেঁটে এল সোফিয়া। খসখসে গলায় বলল, 'আপনাকে আমার কি যে ভাল লাগে!'

'স্যার মাইকেলের কাছ থেকে ফিল্মটা যেভাবে হোক উদ্ধার করতে হবে, সোফিয়া। এই দেশের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে ওটা। প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমারও সর্বনাশ করে দিতে পারে।'

'আমার উচিত ছিল আরও আগে আপনাকে জানানো,' বলল সোফিয়া। 'কিন্তু তখন আমি বুঝিনি আপনাকে কতটা ভালবাসি।'

'এখনও খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি,' তাকে আশ্বস্ত করলেন সিমন সাফারি। 'কাল সকালে মি. রানার সঙ্গে কথা বলব আমি। তাঁকে আমি প্রতিশ্রুতি দেব, অপরাধীরা সবাই উপযুক্ত শাস্তি পাবে। কাজেই প্রমাণ হিসেবে ফিল্মটা তাঁর আমাকে না দিলেই নয়।'

'রানা ওটা আপনাকে দিতে চাইবে বলে মনে হয় না আমার,' বলল সোফিয়া। 'টেপটা আসলে একটা বোমা। তার কাছে ওটার দাম কয়েক মিলিয়ন। সহজে সে দিতে চাইবে না।'

'সেক্ষেত্রে ওটা পাবার জন্যে আমাকে তোমার সাহায্য করতে হবে। এ তো সত্যি যে ওটা তোমার তোলা ফিল্ম। আমার প্রিয় গোলাপ, বলো আমাকে তুমি সাহায্য করবে।'

'আপনার জন্যে আমি সব করতে পারি,' বিড়বিড় করল সোফিয়া। 'বিশ্বাস করুন, আপনার জন্যে আমি মরতেও পারি।' নিজের অজান্তে নিজের নিয়তির লিখন পাঠ করছে সে।

আর কোন কথা হলো না, সিমন সাফারি ও সোফিয়া আবার মিলিত হলো।

তারপর ঘুমিয়ে পড়ল সোফিয়া।

বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙল তার। ভীতিকর সবুজ নরকটায় যেন সারাক্ষণই বৃষ্টি হচ্ছে, ভাবল সে। ভিআইপি গেস্ট বাংলোর ছাদে ঝমাঝম শব্দ হচ্ছে একটানা। চারদিক গভীর ও গাঢ় অন্ধকার।

বিছানাটা হাতড়াল সোফিয়া। তার পাশে জায়গাটা খালি, কেউ নেই। সিমন সাফারি গেলেন কোথায় এই মাঝরাতে? যেখানে শুয়েছিলেন, সোফিয়ার পাশে চাদরটা ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে। তারমানে অনেকক্ষণ আগেই বিছানা ছেড়েছেন তিনি। বাথরুমে গেলেন নাকি? বাথরুমের কথা ভাবতে নিজের ব্লাডারে চাপ অনুভব করল সোফিয়া। বুঝল, সেজন্যেই তার ঘুম ভেঙে গেছে।

চুপচাপ বিছানায় পড়ে থেকে সিমন সাফারির ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছে সে। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল। বিছানার ওপর বসল সোফিয়া। অন্ধকার, মশারির বাইরে কিছুই দেখা যায় না। আরও দু'মিনিট পর মশারি তুলে বেরিয়ে এল বাইরে। অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে এগোল বাথরুমের দিকে। ধাক্কা খেল

একটা চেয়ারের সঙ্গে, খালি পায়ের একটা আঙুল প্রায় থেঁতলে গেল। তারপর আলো জ্বালল সে।

বাথরুমে কেউ নেই। তবে টয়লেট সীট-এর ঢাকনি তোলা রয়েছে দেখে বোঝা গেল তার আগে সিমন সাফারি ভেতরে ঢুকেছিলেন। ঢাকনিটা নামিয়ে বসল সোফিয়া। তার পরনে কোন কাপড় নেই। চোখে এখনও ঘুম লেগে রয়েছে। এলোমেলো মাথার চুল প্রায় ঢেকে রেখেছে চোখ দুটো।

বাইরে এখনও তুমুল বৃষ্টি। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে ওঠায় আলোকিত হয়ে উঠছে জানালাটা। পাশের দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে টয়লেট পেপার নিতে গেল সোফিয়া, বাংলোর পাতলা পার্টিশনের কাছাকাছি চলে এল তার কান। গলার আওয়াজ পেল সে। অস্পষ্ট, তবে পুরুষালি। পাশের কামরা থেকে আসছে।

ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠছে সোফিয়া। মাথাচাড়া দিল কৌতূহল। পার্টিশনের গায়ে কান ঠেকাল সে, এবার সিমন সাফারির গলা চিনতে পারল। তাঁর কথার উত্তর দিল কেউ একজন, যদিও বৃষ্টির শব্দে ভাল করে শোনা গেল না।

তারপর আবার সিমন সাফারির গলা শোনা গেল। 'না,' বললেন তিনি। 'আজ রাতে। আমি চাই কাজটা এখুনি করা হোক।' এতক্ষণে সতর্ক হয়ে উঠেছে সোফিয়া। আর ঠিক তখনই নাটকীয় ভাবে থেমে গেল বৃষ্টি। নিস্তব্ধতা নেমে আসায় ওদের কথা এবার পরিষ্কার শুনতে পেল সে। সিমন সাফারি থামতে আরেকজন কথা বলল। পরিচিত কণ্ঠস্বর।

'আপনি কি ওয়ারেন্টে সই করবেন, মি. প্রেসিডেন্ট?' প্রশ্ন করল চাথার সিং। 'আপনার সৈনিকরা মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করতে পারবে।'

'বোকার মত কথা বলবেন না, মি. সিং। আমি চাই কাজটা গোপনে সারা হবে। স্রেফ খতম করুন ওকে। ক্যাপ্টেন সোলের সাহায্য নিতে পারেন, তবে দেরি করবেন না। কোন প্রশ্ন উঠবে না, লিখিত কিছু থাকবে না। স্রেফ গায়েব করে দিন ওকে।'

'ও, আচ্ছা—হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। বলা হবে জঙ্গলে উনি ছবি তুলতে গেছেন। পরে আমরা একটা সার্চ পার্টি পাঠাব, কিন্তু তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যাবে না। খুবই দুঃখজনক একটা ব্যাপার। কিন্তু মেয়েলোকটার কি হবে? ফিশ ঈগল বে-তে আমরা যে আয়োজন করেছিলাম, সে-ও তার একজন সাক্ষী। আপনি কি চান আমি তারও একটা ব্যবস্থা করি?'

'না! আপনি বোকা নাকি, মি. সিং! দূতাবাস থেকে ফিল্মটা উদ্ধারের জন্যে তার সাহায্য দরকার হবে আমাদের। পরে, টেপটা আমার হাতে এসে পৌঁছুলে, মেয়েলোকটার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাব আমি। তার আগে আপনি শুধু মি. রানাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে খতম করুন। পারবেন তো? আপনার ওপর ভরসা রাখতে পারি আমি?'

'সম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ ভরসা রাখুন। বিশ্বাস করুন, মি. প্রেসিডেন্ট, কাজটা করে আনন্দ পাব আমি। এ আনন্দের কোন তুলনা হয় না। সোলের সঙ্গে বসে

আয়োজনটা চূড়ান্ত করতে এক ঘণ্টা লাগবে আমার। তবে সকাল হবার আগেই কাজটা শেষ করব। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।'

মেঝেতে ঘষা খেল একটা চেয়ার, তারপর শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। একটা দরজা বন্ধ হলো। বাংলোর সিটিংরুমে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

স্থির পাথর হয়ে গেছে সোফিয়া। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না কথাগুলো সত্যি শুনেছে সে। তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে দাঁড়াল, ছুটে গিয়ে অফ করল বাথরুমের আলো। তাড়াতাড়ি অন্ধকারের ভেতর দিয়ে বেডরুমে চলে এল সে, মশারি তুলে ঢুকে পড়ল বিছানায়। চাদরের তলায় আড়ষ্ট হয়ে থাকল তার শরীর, জানে যে-কোন মুহূর্তে ফিরে আসবেন সিমন সাফারি।

তার মাথার ভেতর ঝড় বইছে। সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে সে। কি করবে, কি করা উচিত, কিছুই বুঝতে পারছে না। এ-ধরনের কিছু যে ঘটতে পারে, ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি সে।

তার ধারণা ছিল, সিমন সাফারি টেপটা সংগ্রহ করবেন, আর সম্ভবত গ্রেফতার করা হবে রানাকে, তারপর অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে উবোমো থেকে বের করে দেয়া হবে ওকে–বা এ-ধরনের কিছু। আসলে রানাকে নিয়ে কি করতে পারেন প্রেসিডেন্ট, এ-ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবেনি সে। কিন্তু তুলেও ধারণা করেনি যে ওকে মেরে ফেলার কথা চিন্তা করবে কেউ। কোন বিচার না, অনুশোচনা না, স্রেফ একটা পোকার মত পিষে মেরে ফেলার কথা বলবে কেউ। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ যেন তার চৈতন্য ফিরে এসেছে, বুঝতে পারছে কি সাংঘাতিক একটা বোকামি করে বসেছে সে।

আঘাতটা সামলে উঠতে পারছে না সোফিয়া, মনে হচ্ছে দম আটকে মারা যাবে সে। রানাকে আসলে সে কোনদিনই ঘৃণা করেনি। এরকম একজন মানুষকে কেউ কোনদিন ঘৃণা করতে পারে না। ওর মধ্যে ঋষিতুল্য এমন কিছু গুণ আছে, তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও ওকে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। ঘৃণা করার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং ওর প্রতি অদ্ভুত একটা স্নেহ আছে তার। যদিও একসময় রানা তার বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। এ-কথাও সত্যি যে ওর জীবনে সিমন সাফারি আসার পর রানা তাকে অপমান করেছে, এমন কি বরখাস্ত করেছে, তবু ওর আচরণের পিছনে সঙ্গত কিছু কারণ আছে জানে বলে ওকে ঘৃণা করার প্রশ্ন কখনোই ওঠেনি। রানা খুন হোক, এটা কিভাবে চাইতে পারে সে!

'ব্যাপারটা থেকে দূরে সরে থাকো,' নিজেকে সাবধান করল সোফিয়া। 'যে ভুল করেছ তা আর সংশোধন করার সময় নেই। রানা ওর ভাগ্যের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিক।'

বিছানায় শুয়ে সিমন সাফারির জন্যে অপেক্ষা করছে সে, কিন্তু তিনি ফিরে না আসায় আবার রানার কথা ভাবল। অল্প যে-ক'জন লোককে অন্তর থেকে ভাল লেগেছে তার, তাদের মধ্যে রানা একজন। কেন যেন, দেখলেই ভাল লাগে। এমনকি রানা তাকে প্রত্যাখ্যান করার পরও এই ভাল লাগার অনুভূতিটা হারিয়ে যায়নি ওর মন থেকে। মানুষ হিসেবে অত্যন্ত ভদ্র সে, সুদর্শন, বিবেচক···চিন্তার

ধারাটা দ্রুত বদলাল সোফিয়া।

হৃদয়টাকে রক্তাক্ত কোরো না। তুমি যেভাবে ভেবেছিলে ব্যাপারটা সেভাবে ঘটছে না, তবে এটাকে বলতে হবে রানার দুর্ভাগ্য।

কিন্তু আরেকটা কথা। সিমন সাফারি যা বললেন, তার প্রতি যেন প্রচ্ছন্ন একটা হুমকি আছে। তিনি বললেন, 'টেপটা আমার হাতে এসে পৌঁছুলে, মেয়েলোকটার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাব আমি।' আমি একটা মেয়েলোক? ওর বা তার বলতে পারতেন। মেয়েলোক তো তাচ্ছিল্য বা ঘৃণা করলে বলা হয়। আমি একটা সমস্যা? কিন্তু আমি যে এত বড় একটা উপকার করলাম?

সিমন সাফারি এখনও আসছেন না। বিছানায় বসে কান পাতল সোফিয়া। অনেক আগেই থেমে গেছে বৃষ্টি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মশারি থেকে বেরিয়ে এল সে। বিছানার নিচের দিক থেকে ম্যাক্সিটা তুলে নিয়ে পরল। দরজা পর্যন্ত হেঁটে এসে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ছিটকিনি খুলে তাকাল বারান্দায়।

কাউকে দেখা গেল না। কিছুই নড়ল না। নিঃশব্দে বারান্দায় বেরিয়ে এল সে। তারপর বারান্দা ধরে সামনে এগোল। সিটিংরুমের জানালা থেকে আলো এসে পড়েছে বারান্দার মেঝেতে। জানালাটার পাশে ছায়ায় দাঁড়াল সে। সাবধানে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল।

সিটিংরুমের আরেক প্রান্তে, দেয়ালের দিকে মুখ করে একটা ডেস্কে বসে রয়েছেন সিমন সাফারি, তার দিকে পিছন ফিরে। পরে আছেন খাকি টি-শার্ট আর ক্যামোফ্লেজ ট্রাউজার। হাতে সিগারেট, ডেস্কের ওপর ঝুঁকে কাগজ-পত্রে চোখ বুলাচ্ছেন। দেখে মনে হলো কাজের ভেতর একেবারে ডুবে আছেন।

গেস্ট বাংলোগুলো কম্পাউণ্ড-এর পুবদিকে, ওখানে গিয়ে নিজের বেডরুমে ফিরে আসতে মিনিট দশেক সময় লাগবে সোফিয়ার।

কাঠের ক্যাটওয়াক ভিজে লাল কাদায় পিচ্ছিল হয়ে আছে। তার পায়ে জুতো নেই। গিয়ে হয়তো দেখা যাবে ওর কামরায় নেই রানা। মনে মনে না যাবার অজুহাত তৈরি করছে সোফিয়া। সে সাবধান করলেও, রানা হয়তো তার কথায় কোন গুরুত্ব দেবে না।

রানার কাছে কোন ভাবে ঋণী নই আমি, ভাবল সে। তারপর আবার সিমন সাফারির নির্দেশটা মনে পড়ে গেল, '···আপনি শুধু মি. রানাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে খতম করুন···।'

আলোকিত জানালার পাশ থেকে পিছিয়ে এল সোফিয়া, এখনও জানে না ঠিক কি করবে সে। তারপর কখন যে ক্যাটওয়াক ধরে ছুটতে শুরু করেছে, নিজেও বলতে পারবে না। গাছের ডাল থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে নিচে। তক্তার ওপর পিছলে গেল পা, ছিটকে পড়ল কাদার ওপর। উঠল, ছুটল আবার। ম্যাক্সির সামনের দিকটা লাল কাদায় ভরে গেল।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে সারি সারি গেস্টরুমগুলো দেখতে পেল সোফিয়া। মাত্র একটা রুমে আলো জ্বলছে, বাকিগুলো অন্ধকার। কাছাকাছি এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সে, আলোটা রানার কামরায় জ্বলছে।

গেস্ট হাউসের বারান্দায় উঠল না, তক্তা ফেলা পথের ওপর থেকে লাফ দিয়ে

নেমে ভবনটার পিছন দিকে চলে এল সোফিয়া। রানার জানালায় পর্দা ঝুলছে। লোহার জাল নখ দিয়ে আঁচড়াল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাঠের মেঝেতে চেয়ার সরাবার শব্দ হলো।

আবার নখ ঘষে আওয়াজ করল সোফিয়া। নিচু গলায় ভেতর থেকে জানতে চাইল রানা, 'কে?'

'ফর গডস সেক, রানা, আমি সোফিয়া! তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'ভেতরে এসো, দাঁড়াও, দরজা খুলছি।'

'না-না! সময় নেই! তুমি বেরিয়ে এদিকে চলে এসো। তা না হলে ওরা আমাকে দেখে ফেলবে! জলদি, রানা, জলদি!'

আধ মিনিট পর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘ ও চওড়া একটা কাঠামো, আলোকিত জানালাটা তার পিছনে।

'রানা, ফিশ ঈগল বে টেপ সম্পর্কে সিমন সাফারি জানেন!' রুদ্ধশ্বাসে বলল সোফিয়া।

'কিভাবে জানলেন?'

'সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

'তুমি তাঁকে বলেছ, তাই না?'

'জাহান্নামে যাও···তোমাকে আমি সাবধান করতে এসেছি। উনি নির্দেশ দিয়েছেন, এই মুহূর্তে তোমাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ক্যাপটেন সোলকে নিয়ে এখুনি তোমার কাছে আসছে চাখার সিং। ওরা তোমাকে জঙ্গলে নিয়ে যাবে। ওরা কোন প্রমাণ রাখতে চায় না।'

'এ-সব তুমি জানলে কিভাবে?'

'বোকার মত প্রশ্ন করবে না! বিশ্বাস করো, আমি জানি। সময় নেই, আমি যাই। আমাকে না দেখলে সিমন সাফারি বুঝে ফেলবেন আমি তোমাকে সাবধান করতে এসেছি।' ফেরার জন্যে ঘুরল সোফিয়া।

তার একটা হাত ধরে আবার নিজের দিকে ফেরাল রানা। 'ধন্যবাদ, সোফিয়া,' বলল ও। 'নিজেকে যতটা ভাল মনে করো তারচেয়ে অনেক ভাল মেয়ে তুমি। চাও, আমার সঙ্গে তুমিও পালাবার একটা সুযোগ নেবে?'

মাথা নাড়ল সোফিয়া। কেন যেন তার কান্না পাচ্ছে। 'আমার কিছু হবে না,' বলল সে। 'তুমি যাও। সময় কিন্তু খুব কম, রানা। দেরি কোরো না, এখুনি বেরিয়ে পড়ো।'

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে আবার ছুটল সোফিয়া, তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। লম্বা সাদা ম্যাক্সিতে দেবীর মত লাগছে তাকে।

'অদ্ভুত এক দেবীই বটে,' বিড়বিড় করল রানা, অন্ধকারে পুরো এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল। কি করবে ভাবছে।

শুধু চাখার সিং আর চঙমঙ গড হলে কথা ছিল, ওদের দুজনের সঙ্গে গোপন লড়াইয়ে তবু জেতার একটা সম্ভাবনা ছিল রানার। ওর মতই, তাদেরকেও যা কিছু করার গোপনে করতে হত। দু'দলের কেউই প্রতিপক্ষকে

প্রকাশ্যে আক্রমণ করতে পারত না। কিন্তু তাদের দলে সিমন সাফারি যোগ দেয়ায় ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়িয়েছে। ওকে খুন করার লাইসেন্স পেয়ে গেছে চাখার সিং, লাইসেন্সটা দিয়েছেন এ-দেশের প্রেসিডেন্ট। নেকড়ের মত নীরস হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। লাইসেন্স পাওয়ামাত্র চাখার সিং কাজে নেমে পড়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সোফিয়ার কথাই ঠিক। সেঙ্গি সেঙ্গি থেকে পালাতে হবে ওকে, পুলীরা এসে পৌঁছবার আগেই। তারমানে মাত্র কয়েক মিনিট সময় আছে ওর হাতে।

ভবনের কোণ থেকে বারান্দা ও কমপাউণ্ড-এর চারদিকে দ্রুত চোখ বুলাল রানা। কোথাও কোন শব্দ নেই, চারদিক অন্ধকারে ঢাকা। চুপিসারে নিজের কামরায় ফিরে এল ও। কাবার্ড থেকে ছোট ট্রাভেল ব্যাগটা নামাল। ভেতরে ওর ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র রয়েছে–পাসপোর্ট, এয়ারলাইন টিকেট, ক্রেডিট কার্ড ও ট্রাভেলার্স চেক। টয়লেট ব্যাগ আর কাপড়চোপড় ছাড়া আর তেমন কিছু নেই কামরায়।

লাইট উইণ্ডচিটার পরল রানা, ল্যাণ্ডরোভারের চাবি পকেটে আছে কিনা দেখে নিল। তারপর আলো নিভিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। বারান্দার শেষ মাথার দিকে রয়েছে ল্যাণ্ডরোভার, নিঃশব্দ পায়ে এগোল ও। দরজা খুলে ব্যাগটা প্যাসেঞ্জার সিটের ওপর রাখল। ভাড়া করা সবগুলো ভিটিআর ইকুইপমেন্ট পিছনের কমপার্টমেন্টে প্যাক করা অবস্থায় রয়েছে, আর লকারে আছে ফার্স্ট-এইড ও ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট। তবে কোন অস্ত্র নেই, পুরানো হান্টিং নাইফটা ছাড়া।

ল্যাণ্ডরোভার স্টার্ট দিল রানা। অন্ধকারে এঞ্জিনের শব্দ বড় বেশি জোরাল লাগল কানে। হেডলাইট না জেলে ধীরে ধীরে ক্লাচ ছাড়ল ও, এঞ্জিনের লাগাম টেনে ধরে রাখল। অন্ধকার উঠন ধরে মেইন গেটের দিকে মন্থরবেগে এগোল ল্যাণ্ডরোভার। ও জানে, রাতে গেট কখনও বন্ধ করা হয় না, তবে একজন গার্ড ওখানে ডিউটি দেয়।

ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে খুব বেশি দূর যেতে পারবে না ও, জানে রানা। সেঙ্গি সেঙ্গি থেকে একটাই রাস্তা উবোমো রিভার ফেরীর দিকে চলে গেছে। রাস্তাটায় প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর একটা করে রোড ব্লক।

সেঙ্গি সেঙ্গি থেকে রেডিওর সাহায্যে সতর্ক করা হবে প্রতিটি রোড-ব্লককে। এ/কে ফরটিসেভেন রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে ওর জন্যে অপেক্ষা করবে সৈনিকরা। উঁহুঁ, প্রথম রোড-ব্লকটা পেরুতে পারলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে রানা, তারপর ঢুকতে হবে জঙ্গলে। চিন্তাটা সুখকর নয়। রেইন ফরেস্ট-এ পথ হারিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। তবে অন্য কোন উপায়ও নেই।

প্রথম কাজ সেঙ্গি সেঙ্গি থেকে কেটে পড়া। তারপর যখন যে সমস্যায় পড়বে তখন সেটার সমাধান করতে হবে।

আর এটাই হলো প্রথম সমস্যা, মেইন গেটের ফ্লাডলাইট হঠাৎ জ্বলে উঠতে দেখে ভাবল রানা। গোটা উঠন দিনের মত আলোকিত হয়ে উঠল।

ব্যারাক এলাকা থেকে পাঁচ-সাতটা মূর্তি ছুটে আসছে, ওদিকেই থাকে গার্ডরা। দেখেই বোঝা যায়, তাড়াহুড়োর মধ্যে কাপড় পরেছে তারা, কেউ কেউ শুধু আণ্ডারভেস্ট আর শর্টস পরে আছে। চাথার সিং আর ক্যাপটেন সোল, দু'জনকেই চিনতে পারল রানা।

সোলের হাতে একটা অটোমেটিক পিস্তল, তার পিছু নিয়ে দৌড়াচ্ছে চাথার সিং, হঠাৎ গতি বেড়ে ওঠা ল্যাণ্ডরোভারের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে চিৎকার করছে থামার জন্যে। ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তার মাথার পাগড়িটা। গার্ডদের একজন গেটটা বন্ধ করার চেষ্টা করছে। ইস্পাতের ফ্রেম দিয়ে তৈরি লোহার জাল ঢাকা গেটের একটা পাল্লা এরই মধ্যে রাস্তার প্রায় মাঝখানে এনে ফেলেছে সে।

ল্যাণ্ডরোভারের হেডলাইট জ্বালল রানা, হর্নের বোতামে চেপে রাখল একটা হাত, গতি আরও বাড়িয়ে দিল। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে একদিকে লাফ দিল গার্ড, গেটের তালা না লাগানো পাল্লা ল্যাণ্ডরোভারের ধাক্কায় পুরোপুরি খুলে গেল। সগর্জনে বেরিয়ে এল গাড়ি।

পিছন থেকে ভেসে এল অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ। ল্যাণ্ডরোভারের অ্যালুমিনিয়ামের গায়ে চার-পাঁচটা বুলেট লাগল, হুইলের নিচে মাথা নামিয়ে আত্মরক্ষা করল রানা, অ্যাকসিলারেটরে চেপে রেখেছে পা।

প্রথম বাঁকটা সবেগে ছুটে এল ওর দিকে। আরও এক পশলা গুলি লাগল ল্যাণ্ডরোভারের পিছনে। পিছনের জানালা বিস্ফোরিত হলো, মেরুদণ্ডের কাছে একটা ধাক্কা খেল রানা। আগেও গুলি খেয়েছে ও, অনুভূতিটা কি রকম হয় জানে। পিঠের ওপর দিকে ঢুকেছে বুলেট, শিরদাঁড়ার কাছাকাছি–ডাক্তারদের ভাষায়, মারাত্মক আঘাত। সারা শরীর আড়ষ্ট ও ঠাণ্ডা হয়ে গেল রানার, আশঙ্কা করল শিরা ছিঁড়ে যাওয়ায় রক্তক্ষরণ শুরু হবে ফুসফুসে।

যত দূর সম্ভব সরে যাও, নিজেকে পরামর্শ দিল রানা। গতি না কমিয়ে বাঁক ঘুরল ও। দু'চাকার ওপর ভর দিয়ে মোড় নিল ল্যাণ্ডরোভার, একটুর জন্যে ওল্টাল না।

রিয়ার-ভিউ মিররে যখন তাকাল রানা, গাছপালার আড়ালে ক্যাম্পের আলো অস্পষ্ট দেখাল : অন্ধকারে আলোর একটা আভা মাত্র।

রক্তের গরম স্রোত পিঠ বেয়ে নেমে আসছে। গলায় এখনও কোন বাধা অনুভব করছে না বা কাশি পাচ্ছে না। নিজেকে ওর দুর্বলও লাগছে না। তবে পরে কি হবে কে জানে। ক্ষতটা অসাড় হয়ে আছে। পরিষ্কার কাজ করছে মাথা। থামার কোন দরকার নেই, এগিয়ে যেতে পারবে ও।

প্রথম রোড-ব্লকটা কোথায় জানে রানা। 'প্রায় পাঁচ মাইল সামনে,' মনে করিয়ে দিল নিজেকে। 'প্রথম নদী পারাপারে।'

রাস্তাটা কিভাবে ওখানে পৌচেছে মনে করার চেষ্টা করল। গত তিন দিন ছবি তোলার কাজে ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে বেশ ক'বার ওদিকে যাওয়া হয়েছে ওর। রাস্তার প্রতিটি মোচড় আর বাঁক মনে করতে পারছে।

একটা সিদ্ধান্তে এল রানা। হেলান দিল সীটের গায়ে। হঠাৎ পিঠে কেউ যেন

ছুরি মারল। এখনও রক্ত গড়াচ্ছে, তবে আগের চেয়ে কম।

রক্তক্ষরণ হচ্ছে ভেতরে, ভাবল রানা। এ-যাত্রা তোমার রক্ষা নেই হে।

তবু ল্যাণ্ডরোভারের গতি ধরে রাখল ও। দুর্বল হয়ে পড়ার আগে যত দূর সম্ভব সরে যেতে হবে।

প্রথম রোড-ব্লকের আগে মেইন হাইওয়ে থেকে পাঁচটা লগিং রোড বেরিয়েছে। কোন কোনটায় আগাছা জন্মেছে, ব্যবহার করা হয় না। তবে অন্তত দুটোয় প্রতিদিন ভারি যানবাহন চলাচল করে। এই দুটোর প্রথমটাকে বেছে নিল রানা, সেঙ্গি সেঙ্গি থেকে দু'মাইল দূরে। শাখা রোডটায় ঢুকে পশ্চিম দিকে এগোল ল্যাণ্ডরোভার। ওদিকে জায়ারে সীমান্ত, নব্বুই মাইল দূরে। লগিং ট্রাকগুলো অবশ্য বনভূমির ভেতর দিয়ে মাইল পাঁচেকের বেশি এগোয় না, তার আগেই পেয়ে যায় মোমুর তৈরি খাদ।

ল্যাণ্ডরোভারটা কোথাও লুকিয়ে রেখে বাকি আশি মাইল পায়ে হেঁটে এগোতে হবে রানাকে। এই জঙ্গল সম্পর্কে ওর কোন ধারণা নেই। শেষ দিকটায় উঁচু পাহাড় পড়বে সামনে, পেরুতে হবে বরফ ঢাকা প্রান্তর। পিঠে গাঁথা বুলেটের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বুঝল, স্বপ্ন দেখছে ও। এই দূরত্ব পাড়ি দেয়া ওর পক্ষে কোনদিন সম্ভব হবে না।

রাস্তাটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। গর্তগুলো কোথাও কোথাও হাঁটু সমান গভীর। লাল ধুলোর মেঘ প্রায় ঢেকে দিল উইণ্ড স্ক্রীন, ঝাপসা করে দিল হেডলাইটের আলো। সামনের রাস্তা মাত্র বিশ ফুট পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে ও।

পিঠের ক্ষতটা ব্যথা দিতে শুরু করেছে। তবে মাথাটা এখনও পরিষ্কার। হাত দুটো চোখের সামনে তুলল রানা–না, কাঁপছে না।

হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক, গাছপালার ফাঁকে আলো দেখা যাচ্ছে। একটা লগিং ট্রাক এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ওটাকে দেখেই একটা বুদ্ধি এল মাথায়। ল্যাণ্ডরোভারের গতি কমিয়ে রাস্তার দু'পাশের ঝোপগুলোর ওপর চোখ বুলাল রানা। একটা ফাঁক দেখে ঢুকে পড়ল ভেতরে, নিভিয়ে দিল হেডলাইট।

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ গজ এগিয়ে এসে থামল ল্যাণ্ডরোভার, ঘন আর উঁচু ঝোপ প্রায় ঢেকে রেখেছে ওটাকে, রাস্তা থেকে দেখা যাবে না। এঞ্জিন বন্ধ করল রানা, কান পেতে শুনল লগিং ট্রাকটা ওর ফেলে আসা রাস্তা ধরে সেঙ্গি সেঙ্গির দিকে চলে গেল।

ট্রাকের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যাবার পর সিটে বসেই সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, পিঠের ক্ষতটা পরীক্ষা করবে। ভয়ে ভয়ে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা হাত পিঠে তুলল, আঙুলগুলো একটু একটু করে এগোল ক্ষতটার দিকে।

হঠাৎ চিৎকার করল রানা, 'আরে!' যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে ক্ষতের মুখ থেকে সরে এল হাতটা। ভেতরের আলো জ্বালল ও, তারপর আবার আঙুলের ডগা দিয়ে ক্ষতটার মুখ পরীক্ষা করল। মসৃণ কি যেন ঠেকছে আঙুলে, মসৃণ আর পিচ্ছিল। চারপাশে আঙুল বুলাতে মনে হলো জিনিসটা লম্বাটে টিউব আকৃতির। স্বস্তিতে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল ওর। বুলেটই ঢুকেছে ওর পিঠে, তবে চামড়ার নিচেই লুকিয়ে রয়েছে ওটা, পাঁজরের হাড় ভেঙে গভীরে ঢুকতে পারেনি। একটু

চেষ্টা করলে হয়তো নখ দিয়ে খুঁটলেই বের করে আনা যাবে।

শরীরটা শক্ত করে নখ দিয়ে খোঁচাতে শুরু করল রানা। ব্যথায় দম বন্ধ হয়ে এল ওর। প্রথমে সামান্য একটু নড়ল বুলেটটা, তারপর যেন আরও একটু ভেতর দিকে ঢুকে গেল। একবার যখন শুরু করেছে, হাল ছাড়ার পাত্র নয় ও। মিনিট পাঁচেক চেষ্টা করার পর ঠিকই মাংসের ভেতর থেকে বের করে আনল ওটাকে। আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে, তবে নিজেকে অভয় দিল রানা, এতে তুমি মরবে না। বুলেটটা জানালা দিয়ে ঝোপের ভেতর ফেলে দিল, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ফার্স্ট এইড কিটটা।

ক্ষতটা পিঠে, যত্ন নেয়া কঠিন। তবু প্রচুর পরিমাণে বেটাডিন অয়েন্টমেন্ট লাগাল রানা, কোন রকমে একটা ব্যাণ্ডেজও বাঁধল, গিটটা থাকল ওর বুকের মাঝখানে।

কাজ করার সময় সারাক্ষণ রাস্তার দিকে কান পেতে ছিল রানা, তবে শুধু পোকা-মাকড় আর জীব-জন্তুর ক্ষীণ আওয়াজ পেয়েছে।

হাতে টর্চ নিয়ে রাস্তায় উঠে এল রানা। ও যেমন আশা করেছিল, লগিং ট্রাকের ভারি চাকা ল্যাণ্ডরোভারের তৈরি সমস্ত দাগ বদলে দিয়েছে। অক্ষত দাগ দেখা গেল শুধু ঝোপগুলোর কাছাকাছি, যেগুলো ভেঙে জঙ্গলের ভেতর ঢুকেছে ওটা। পাতাসমেত একটা ভাঙা গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে জায়গাটা ঝাড় দিল ও, তারপর কাদার ওপর শুকনো মাটি ছড়িয়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল। এখন আর দাগগুলো চেনা যাবে না। গাছের ডালটা ঝোপের ভেতর ফেলে দিল রানা, এই সময় দেখতে পেল সেঙ্গি সেঙ্গির দিক থেকে আরেকটা লগিং ট্রাক আসছে।

মুখে খানিকটা কাদা মেখে পিছিয়ে ঝোপের ভেতর ঢুকল রানা, মাটিতে শুয়ে তাকিয়ে থাকল রাস্তার দিকে। ওর পরনের উইণ্ডচিটার সবুজ রঙের, ঝোপের পাতার সঙ্গে এক হয়ে মিশে আছে, হেডলাইটের আলোয় আলাদাভাবে চেনা যাবে না। একটু পরই পরীক্ষায় ফেলা হলো রানাকে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল লগিং ট্রাক। কাছাকাছি আসার পর দেখল, না, লগিং ট্রাক নয়—আর্মি ট্র্যান্সপোর্ট, খয়েরি ও সবুজ রঙ করা। পিছনে গিজ গিজ করছে চিটা সৈনিক। ড্রাইভারের ক্যাব-এ চাখার সিং-এর সাদা পাগড়ি দেখা গেল। পিছন থেকে একজন সৈনিক রাস্তার দু'পাশের ঝোপের ওপর স্পটলাইটের আলো ফেলছে। কোন সন্দেহ নেই, ওকেই তারা খুঁজতে বেরিয়েছে।

মাথা নামিয়ে হাতের ভাঁজে মুখ লুকাল রানা, ওর সামনে দিয়ে ছুটে গেল স্পটলাইটের আলো। গতি না কমিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ট্রাকটা। খানিক পর আবার নিস্তব্ধতা নামল বনভূমিতে।

মাটি থেকে উঠে ল্যাণ্ডরোভারের কাছে ফিরে এল রানা। দ্রুত হাতে লকার থেকে কয়েকটা দরকারী জিনিস বের করল, ওগুলোর মধ্যে একটা কম্পাসও রয়েছে। জিনিসগুলো ছোট একটা ব্যাগে ভরল। ফার্স্ট এইড কিট থেকে নিল ফিল্ড ড্রেসিং অ্যান্টিসেপটিক ও অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ট্যাবলেট। ল্যাণ্ডরোভারে কোন খাবার নেই। জঙ্গলে যা পাওয়া যায় তাই খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে ওকে। ব্যাগটা

কাঁধে ঝুলিয়ে রওনা হলো ও।

ভোরের আলো ফোটার আগেই মোমু ট্র্যাক পেরুতে হবে ওকে, ভাবল রানা। ট্র্যাকটা পেরুবার সময় খোলা জায়গায় থাকবে ও, সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায়। তারপর পাওয়া যাবে বনভূমির আড়াল।

একে অন্ধকার, তার ওপর ঘন জঙ্গল, দিক ঠিক রাখা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। কয়েকশো গজ পর পর টর্চ জ্বালতে বাধ্য হলো রানা, দেখে নিতে হলো কম্পাস। পায়ের নিচে নরম হয়ে আছে কাদা, পথটাও আঁকাবাঁকা, ফলে দ্রুত এগোনো যাচ্ছে না। মোমুর তৈরি খাদে যখন পৌঁছুল, খোলা আকাশ আলোকিত হতে শুরু করেছে।

ফাঁকা জায়গাটার উল্টোদিকের গাছপালা অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল রানা। হপ্তা কয়েক আগে এই জায়গার কাজ শেষ করে পাঁচ-সাত মাইল উত্তরে এগিয়ে গেছে মোমু। জঙ্গলের এদিকটা নির্জন থাকারই কথা, যদি না ওকে বাধা দেয়ার জন্যে ক্যাপটেন সোল সৈনিকদের পাঠিয়ে থাকে।

ঝুঁকিটা নিতে হবে ওকে। জঙ্গলের আড়াল ছেড়ে ফাঁকা জায়গাটা পেরুতে শুরু করল রানা। লাল কাদায় ডেবে গেল জুতো সহ গোড়ালি। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে, 'হল্ট!' বলে চিৎকার শুনতে পাবে, কিংবা ধাক্কা খাবে বুলেটের। উল্টোদিকের গাছপালার আড়ালে পৌঁছে গেল ও, কোন বিপদ হলো না। তবে ক্লান্তিতে হাঁপাতে শুরু করেছে।

আরও এক ঘণ্টা হাঁটার পর প্রথমবার বিশ্রামের জন্যে থামল রানা। এরইমধ্যে তাপমাত্রা বেড়ে গেছে, শর্টস আর বুট ছাড়া বাকি সব খুলে ফেলল গা থেকে। কাপড়গুলো গোল পাকিয়ে নরম ঘাসের ওপর রেখে দিল। ঝড়-বৃষ্টি-রোদে থাকার অভ্যেস আছে ওর, তাতে করে চামড়ার স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি অনেকটা বেড়ে গেছে, পোকামাকড়ের হুল বা কাঁটা সহজে তেমন ক্ষতি করতে পারে না। এমন কি সেৎসি মাছির কামড়ও সহ্য করতে পারে ও। পিঠের ক্ষতটা ঢাকা থাকলেই চলবে, বিপদের আর কোন ভয় আপাতত নেই।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হলো রানা। কম্পাস আর হাতঘড়ির ওপর নজর রাখছে, হিসাব রাখছে দশ কদম এগোতে সময় লাগছে কতক্ষণ। প্রতি দু'ঘণ্টা পর পর দশ মিনিটের জন্যে বিশ্রাম নিল ও। সন্ধের সময় আন্দাজ করল, দশ মাইলের মত এগিয়েছে। এই গতিতে হাঁটলে জায়ারে সীমান্তে পৌঁছুতে আটদিন লাগবে ওর। অবশ্যই এই গতি ধরে রাখা সম্ভব হবে না। সামনে পাহাড় আছে, আছে গ্রেসিয়ার ও বরফ ঢাকা প্রান্তর। শুকনো পাতা জড়ো করে বিছানা তৈরি করল রানা, শোয়ার সময় মনিকার কথা ভাবল। কে জানে এই মুহূর্তে কোথায় কি করছে মেয়েটা। তারপরই মনে পড়ল সোফিয়ার কথা।

মেয়েটাকে ওর সঙ্গে আসার জন্যে জোর করা উচিত ছিল। লোভ আর মাত্রা ছাড়ানো উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এই দুটোই সবচেয়ে বড় দুর্বলতা সোফিয়ার। ও জোর করলেও সে আসত বলে মনে হয় না। জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে ওকে সাবধান করে দিয়েছে সে, সেজন্যে তার প্রতি কৃতজ্ঞ ও। কিন্তু মনটা খারাপ লাগছে তার পরিণতির কথা ভেবে। শেষ পর্যন্ত মেয়েটা না অকালে প্রাণ

হারায়।

ঘুম ভাঙার পর রানা দেখল, ভোর হতে শুরু করেছে। খিদে পেয়েছে ওর, পিঠের ক্ষতটায় টান ধরায় ব্যথা করছে। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল ফুলে আছে জায়গাটা, আগুনের মত গরম। মনে ভয় ধরে গেল—ইনফেকশন নাকি? যতটা সম্ভব নতুন করে যত্ন নিল ক্ষতটার।

দুপুরের দিকে অসহ্য হয়ে উঠল খিদে। কয়েকটা গাছের মগডালে চড়ে পাখির ডিম খুঁজল। পেল বটে, কিন্তু মাত্র একজোড়া ছোট ডিমে পেট ভরল না। আবার রওনা হলো পশ্চিমে, হাতে কম্পাস। বিকেলের দিকে ব্যাঙের ছাতা খেল। খানিক পর সামনে পড়ল ছোট একটা ঝর্ণা।

ঝর্ণার কিনারায় বসে পানি খাচ্ছে, দেখতে পেল জলাশয়ের তলায় গাঢ় চুরুট আকৃতির কি যেন একটা শুয়ে রয়েছে। লম্বা একটা ডাল কুড়িয়ে আনল রানা, ছুরি দিয়ে চেঁছে চোখা করল ডগাটা। তারপর খুঁজে বের করল পিপড়েদের একটা কলোনি। একটা শুকনো পাতায় কয়েকটা পিপড়ে নিল ও, সেগুলোকে ফেলে দিল ঝর্ণার পানিতে, তারপর পিছিয়ে এল কিনারা থেকে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পানির তলা থেকে উঠে এল মাছটা, টপাটপ খেতে শুরু করল পিপড়েগুলোকে। সদ্য তৈরি বর্শাটা সবেগে ছুঁড়ল রানা, পেটে গেঁথে পানি থেকে তুলে আনল মাছটাকে। প্রায় ওর হাতের মত লম্বা একটা ক্যাটফিশ। আগুনে সেদ্ধ করে খানিকটা খেল রানা, বাকিটা পাতায় জড়িয়ে রেখে দিল। অন্তত দিন দুয়েক চলে যাবে ওর।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর সারা শরীরে ব্যথা অনুভব করল রানা। পিঠের ক্ষতটা দপ দপ করছে, গ্যাস ও ডিসেন্ট্রিতে ফুলে আছে পেট—কারণটা ঝর্ণার পানি, নাকি ব্যাঙের ছাতা বুঝতে পারল না। দুপুরের মধ্যে ক্ষতটায় ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠল। অসম্ভব দুর্বল বোধ করছে ও। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর। এতটা দুর্বল হয়ে পড়ার কারণ ডায়েরিয়া।

শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে কেউ যেন জ্বলন্ত এক টুকরো কয়লা চেপে ধরে আছে।

প্রায় এরকম সময়েই প্রথম একটা অনুভূতি হলো রানার, কেউ যেন অনুসরণ করছে ওকে। ব্যথা ও জ্বর সত্ত্বেও ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ সজাগ। পিছন দিকে যতবার তাকাল রানা, দেখতে না পেলেও কোন মানুষের উপস্থিতি অনুভব করতে পারল ও। উপলব্ধি করল, শিকারি শিকার করার অপেক্ষায় আছে। অপেক্ষায় আছে সুযোগের।

অ্যান্টি-ট্র্যাকিং পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে ওকে, ভাবল রানা। তাতে অবশ্য এগোনোর গতি অনেক কমে যাবে। অনুসরণরত লোকটা বাস্তব হোক বা কল্পনা, অ্যান্টি-ট্র্যাকিং পদ্ধতির সাহায্য নিলে খসানো সম্ভব হবে তাকে। অবশ্য লোকটা যদি অনুসরণে দক্ষ হয়, বনভূমির এদিকটা যদি তার চেনা এলাকা হয়, এক সময় ঠিকই রানাকে ধরে ফেলবে সে।

সামনে নদী দেখে পানিতে নামল রানা, অনেক দূরে উঠল পায়ের কোন ছাপ না রেখে। এরপর থেকে সমস্ত দাগ ও ছাপ মুছতে মুছতে এগোল ও। হাঁটার গতি

আরও অনেক কমে গেল। জ্বরটা বাড়ছে। পেটের অসুখটাও ভালর দিকে যাচ্ছে না। পিঠের ক্ষতে সংক্রমণ শুরু হয়েছে, কোন সন্দেহ নেই। দু'বার বমি করল রানা। নিশ্চিতভাবে জানে, ফেউটা এখনও লেগে আছে পিছনে, প্রতি ঘণ্টায় কাছে চলে আসছে আরও।

চার

দীর্ঘ অনেকগুলো বছর পোচিং-অপারেশন-এর সঙ্গে জড়িত চাখার সিং। পোচার হিসেবে অত্যন্ত দক্ষ সে। শিকারিদের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনেকগুলো পদ্ধতি আছে তার। কোন কোন এলাকায় যোগাযোগ করাটা সহজ। জাম্বিয়া বা মোজাম্বিকে তাকে শুধু কোন গ্রামে গিয়ে কারও বউ বা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে হয়, তারাই তার হয়ে খবর পৌঁছে দেয় শিকারীকে। বতসোয়ানা বা জিম্বাবুইয়েতে নির্ভর করে সে লোকাল পোস্টাল কর্তৃপক্ষের ওপর, একটা চিঠি বা টেলিগ্রাম পাঠায়। কিন্তু উবোমোয় বর্বর একজন পিগমির সঙ্গে রেইন ফরেস্টে যোগাযোগ করাটা খুবই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

এক্ষেত্রে একটাই উপায় আছে। মেইন হাইওয়ে থেকে নেমে প্রতিটি দোকানে ঢুঁ মারতে হবে, কিংবা পথে যার সঙ্গে দেখা হবে তাকেই ঘুষ দিয়ে অনুরোধ করতে হবে সে যেন ওজি হাবিবকে খবর দেয়। গভীর, দুর্ভেদ্য বনভূমিতে পিগমিরা নিজেদের মধ্যে যেভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তবে এ-কথা ঠিক যে পিগমিরা গল্প করতে ভালবাসে, ভালবাসে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করতে। এক গোত্রের কোন লোক হয়তো মধু সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে, তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আরেক গোত্রের কোন মহিলার, যে কিনা নিজের এলাকা থেকে বহুদূরে চলে এসেছে ওষধি গাছ-গাছড়ার সন্ধানে। এভাবেই খবর পৌঁছে যায়, পাহাড়চূড়া থেকে তীক্ষ্ণ অথচ সুরেলা কণ্ঠে চিৎকার করে কেউ, উপত্যকা থেকে শোনে কোন ভবঘুরে অথবা শিকারী, আবার কখনও বা বিশাল নদীর মাঝখানে এক ক্যানু থেকে আরেক ক্যানুতে পৌঁছে যায় খবর। যার খবর তার হয়তো পেতে সময় লেগে যায় কয়েক হপ্তা, তবে ভাগ্য ভাল হলে দু'চারদিনের মধ্যেও পেয়ে যায়।

এবার চাখার সিংকে খুবই ভাগ্যবান বলতে হবে। নদী পারাপারে একদল পিগমি মেয়েলোককে খবরটা দেয়ার দু'দিন পরই বনভূমির নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হলো ওজি হাবিব। তার যা বৈশিষ্ট্য, সবুজ পাঁচিল ফুঁড়ে যেন ভোজবাজির মত উদয় হলো সে, এসেই তামাক ও অন্যান্য উপহার দাবি করল।

'তুমি আমার হাতি মেরেছ?' জানতে চাইল চাখার সিং।

নাকের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে ময়লা পরিষ্কার করল ওজি হাবিব, খসখস করে উরুসন্ধি চুলকাল। 'আপনি আমাকে না ডেকে পাঠালে হাতিটা এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেত।'

'কিছু মরেনি,' বলল চাখার সিং। 'কাজেই কোন উপহারও পাওনা হয়নি তোমার।'

'সামান্য একটু তামাক?' আবেদন জানাল ওজি হাবিব। 'আমি তো আপনার বিশ্বস্ত গোলাম। আমার হৃদয় আপনার প্রতি ভালবাসায় ভরপুর। বেশি না, এক মুঠো তামাক শুধু?'

আধ মুঠোরও কম তামাক দিল তাকে চাখার সিং। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে মুখের ভেতর তামাক ভরল ওজি হাবিব। চাখার সিং বলল, 'এর আগে তোমাকে যে-সব উপহার দেব বলেছিলাম, তার দ্বিগুণ উপহার দেব তুমি যদি আরেকটা জানোয়ারকে খুন করতে পারো। খুন করে ওটার মাথা এনে দিতে হবে আমাকে।'

'কি জানোয়ার? সিংহ না চিতা?' সতর্ক হলো ওজি হাবিব, তীক্ষ্ণ হলো তার দৃষ্টি। 'নাকি এটাও একটা হাতি?'

'না,' বলল চাখার সিং। 'এটা একটা মানুষ।'

'আপনি আমাকে মানুষ খুন করতে বলেন!' লাফ দিয়ে সিধে হলো ওজি হাবিব। 'ওরে বাপরে বাপ! মানুষ মারলে আর রক্ষে নেই, পুলিস এসে আমার গলায় রশি পরাবে।' আড়চোখে ক্যাপটেন সোলের দিকে তাকাল সে।

'না, শোনো। এই যে দেখছ আমার ডান হাতটা নেই, নেই ওই লোকটার কারণে—সেজন্যেই তাকে আমি জানোয়ার বলছি। আর পুলিসের কথা বলছ?' হাসল চাখার সিং। 'এটা তো পুলিসেরই কাজ, বোকা! সরকার তোমাকে এই কাজের জন্যে পুরস্কার দেবে। লোকটা নাম্বার ওয়ান হারামি। সরকারের অনেক ক্ষতি করে জঙ্গলে পালিয়ে এসেছে।' পাশে দাঁড়ানো ক্যাপটেন সোলের দিকে তাকাল সে। 'কি, ঠিক বলিনি?'

'জ্বী, ঠিক বলেছেন,' সাক্ষী দিল ক্যাপটেন সোল। 'যে লোকটাকে তুমি খুন করবে সে সাদাও নয়, আবার কালোও নয়। সরকারের তরফ থেকে আমরা তোমাকে অনেক পুরস্কার দেব।'

ক্যাপটেনকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল ওজি হাবিব। ইউনিফর্ম, আগ্নেয়াস্ত্র, রঙিন সানগ্লাস ইত্যাদি দেখে তার মনে হলো, সরকারের বড় কোন কর্মকর্তাই হবে লোকটা। কাজেই প্রস্তাবটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করল সে। যুবা বয়েসে জায়ারেতে সাদা সরকারী কর্মকর্তাদের একজনকে খুন করেছিল সে, তবে সেটা ছিল যুদ্ধের সময়। কাজটা খুব সহজ ছিল, কালো নেতাদের কাছ থেকে ভাল পুরস্কারও পেয়েছিল সে। বিদেশী লোকদের পিছু নেয়া সহজ, জঙ্গলের ভেতর অসহায়বোধ করে তারা। 'লোকটা কি বিদেশী?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ,' বলল চাখার সিং, বুঝতে পারল ওজি হাবিবের চিন্তাধারা কোন পথে এগোচ্ছে। 'জঙ্গলের ভেতর হারিয়ে যাওয়া অসহায় একটা শিশু বলতে পারো তাকে।'

'কতটা তামাক পাব আমি?'

'আমার কাছ থেকে পাবে যতটা তুমি বইতে পারবে,' বলল চাখার সিং।

'ওই পরিমাণ আমিও দেব, যতটা তুমি বইতে পারবে,' বলল ক্যাপটেন সোল।

'তাকে কোথায় পাব আমি?' জানতে চাইল ওজি হাবিব।

কোথায় খুঁজতে হবে বলে দিল চাখার সিং, জানাল রানা কোনদিকে যাচ্ছে বলে তার ধারণা।

'আপনারা শুধু তার মুণ্ডুটা চান? খাবেন বলে?' জিজ্ঞেস করল পিগমি ওজি হাবিব।

'আরে না!' হেসে উঠল চাখার সিং। 'মুণ্ডুটা দেখে আমরা বুঝতে চাই তুমি ঠিক তাকেই মেরেছ কিনা।'

'প্রথমে আমি এই লোকটার মুণ্ডু কেটে আনব,' আনন্দে নাচতে নাচতে বলল ওজি হাবিব, 'তারপর আনব হাতির দাঁত। তখন আমার হাতে যত তামাক থাকবে, অত তামাক দুনিয়ার কারও হাতে থাকবে না।' কালো একটা ভূতের মতই এক নিমেষে জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

সকালের দিকে, তাপ এখনও ছড়ায়নি, গোনডালা ক্লিনিকে বসে কাজ করছে মনিকা রিভেরা। অন্যান্য দিনের চেয়ে রোগীর সংখ্যা আজ বেশি তার। বেশিরভাগেরই গায়ে ফোসকা পড়েছে। এমন একটা ঘা, চিকিৎসা না করালে হাড় পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। বাকি লোকগুলো ম্যালেরিয়ার শিকার। এইডস-এর দু'জন নতুন রোগীও আছে। লক্ষণ চেনার জন্যে রক্ত পরীক্ষার দরকার নেই তার, ফোলা লিমফগ্ল্যাণ্ড আর জিভ ও গলার ভেতর সাদা ঘা দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে।

ব্যাপারটা নিয়ে ড. শেখ ফাহিম ফয়সলের সঙ্গে আলোচনা করেছে মনিকা। রোগী দু'জনের ওপর নতুন ওষুধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তিনি। সিলেপি গাছের ছাল থেকে তৈরি করা ভেষজ, ইতিমধ্যে ওদের মধ্যে যথেষ্ট আশার সঞ্চার করেছে। ওষুধ তৈরি ও মাত্রা নির্ধারণে মনিকাকে সাহায্য করলেন তিনি। কি পরিমাণে ওষুধ খাওয়ানো দরকার, এটা রোগের বিভিন্ন লক্ষণ দেখে আলোচনা সাপেক্ষ একটা ব্যাপার। আলোচনা চলছে, এই সময় বাইরে হৈ-চৈ শোনা গেল।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন ড. ফাহিম ফয়সল। 'তোমার সেই খুদে বন্ধু হাজির হয়েছে,' মনিকাকে বললেন তিনি। আনন্দে হেসে উঠল মনিকা, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোদজি হাবিব আর তার স্ত্রী পারুমা, রোগীদের সঙ্গে হাসাহাসি ও গল্প করছে। মনিকাকে দেখে বুড়ো-বুড়ি প্রতিযোগিতা শুরু করল, কে কার আগে ওর কাছে পৌঁছুতে পারে। ছুটে এসে দু'জনেই মনিকার একটা করে হাত চেপে ধরল, একজনের চিৎকারকে ছাপিয়ে উঠল অপরজনের উল্লাসধ্বনি। শেষবার দেখা হবার পর ওদের গোত্রে উত্তেজনাকর কি কি ঘটেছে, সব এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলার ইচ্ছে তাদের। বারান্দার ওপরের ধাপটায় বসল মনিকা, বুড়ো-বুড়িকে দু'পাশে নিয়ে।

'পুইলির একটা মেয়ে হয়েছে। পূর্ণিমার পর একদিন তোকে দেখাতে নিয়ে আসবে,' বলল পারুমা।

'জাল দিয়ে শিকার ধরার বিরাট আয়োজন চলছে, গোত্রপ্রধানরা সবাই সভায়

বসবে…,' নিজের কথা বলে চলেছে লোদজি হাবিব।

'গাছের শিকড় চেয়েছিলি, মনে আছে? এক গাদা নিয়ে এসেছি…,' অকারণেই খিল খিল করে হেসে উঠল বুড়ি, মুখে একটা দাঁতও নেই। বয়েসের আঁচড় মাকড়সার জাল এঁকে রেখেছে চামড়ায়, এমন ঝুলে আছে যে চোখ দুটো প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।

'আমি দুটো বাঁদর মেরেছি,' সগর্বে জানাল লোদজি হাবিব। 'একটার চামড়া এনেছি তোর জন্যে, ওটা দিয়ে তুই সুন্দর একটা হ্যাট বানাতে পারবি।'

'তোমার খুব দয়া, লোদজি,' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল মনিকা। 'কিন্তু যেজন্যে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম, সেঙ্গি সেঙ্গির খবর কি বলছ না যে? সেই হলুদ মেশিনগুলোর কথা বলো, যেগুলো মাটি খায়, জঙ্গলের গাছগুলোকে ফেলে দেয়। মায়াভরা চোখ, সেই বিদেশী লোকটার কথা বলো। মাথা ভর্তি চুল, অনেক লম্বা। আর সেই মেয়েটার কথা বলো–আগুনের মত চুল, কালো বাক্সের ভেতর তাকিয়ে থাকে সব সময়।'

'অদ্ভুত,' চেহারা গম্ভীর করে বলল লোদজি হাবিব। 'অদ্ভুত খবর আছে। লম্বা মানুষ, মায়াভরা চোখ, সেঙ্গি সেঙ্গি থেকে পালিয়েছে। জঙ্গলে ঢুকে লুকিয়ে পড়েছে সে।' পারুমা বলে ফেলবে, এই ভয়ে খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছে সে। 'আরও অদ্ভুত খবর, সেঙ্গি সেঙ্গির সরকারী কর্তা আমার ভাই ওজি হাবিবকে প্রস্তাব দিয়েছে ওই লোককে খুন করতে পারলে তাকে বিরাট পুরস্কার দেয়া হবে।'

স্থির পাথর হয়ে গেল মনিকা। 'কি বললে?'

'লোকটার খুব বিপদ,' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল লোদজি হাবিব। 'ধরে নে মায়াভরা চোখের মুণ্ডু নেই। আমার ভাই ওজি হাবিব ওটা কেটে ফেলবে।'

ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল মনিকা। মাথাটা ঘুরে উঠল তার, অসুস্থ বোধ করছে। ওকে হাঁপাতে দেখে ভয়ে চুপ করে গেল লোদজি হাবিব, বুড়ো-বুড়ি পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

'খুন করবে? ওজি হাবিব রানাকে খুন করবে? ওহ্ গড!' বিড় বিড় করছে মনিকা, অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল বারান্দায়। 'এখন আমি কি করব!'

'কারও কিছু করার নেই গো, আপামণি,' ভয়ে ভয়ে বলল পারুমা। 'ওজি হাবিব হারামির হাড়। পুরস্কারের লোভে নিজের মাকেও খুন করতে তার হাত কাঁপবে না।'

'এ আমি হতে দেব না!' পায়চারি থামিয়ে ওদের সামনে দাঁড়াল মনিকা। 'যেভাবে হোক এ আমি ঠেকাব। কিন্তু… কিভাবে…। লোদজি হাবিব, তুমি আমার বাপ! ওই মায়াভরা চোখ, যার কথা আলোচনা করছি আমরা, তাকে তুমি যেভাবে পারো বাঁচাও! সে আমার মনের মানুষ, লোদজি হাবিব!' মনিকার চোখ ভিজে গেছে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল লোদজি হাবিব ও পারুমা। 'যেভাবে হোক ওজি হাবিবকে বাধা দাও তুমি। লোকটাকে অবশ্যই উদ্ধার করে গোনডালায় নিয়ে আসবে তুমি। আমি কি বলছি বুঝতে পারছ, লোদজি হাবিব? এখুনি বেরিয়ে পড়ো। যাও, তাড়াতাড়ি যাও! আমিও আরেক দিকে যাচ্ছি। তাকে আমরা খুঁজে বার করব…।'

'তোর আদেশ যাতে পালন করে সেটা দেখার জন্যে আমিও ওর সঙ্গে যাব,' বারান্দার ধাপ ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে দাঁড়াল পারুমাও। 'তুই তো জানিস, আপামণি, স্বামীটা আমার বোকা আছে–জঙ্গলের ভেতর ধিঙ্গি কোন মেয়ে দেখলে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়, সব ফেলে তার পিছনে ছোটে।' স্বামীর দিকে ফিরল সে। 'আয় রে মিনসে, তাড়াতাড়ি ছুট লাগা।' কনুই দিয়ে বুড়োর পাঁজরে খোঁচা মারল বুড়ি। 'আপামণি কি বলল, ওনলি তো? লোকটা ওর মনের মানুষ আছে রে। চল তাকে খুঁজে বের করি, আপামণিকে এনে দিই। দেরি করলে ওজি শয়তানটা তার মুণ্ডু কেটে সেঙ্গি সেঙ্গিতে…।'

দাঁড়াল ওজি হাবিব, বনভূমির চারদিকে চোখ বুলাল, তারপর ভাঁজ করা একটা হাঁটু গাড়ল মাটিতে। ঝুঁকে পায়ের ছাপ পরীক্ষা করছে সে। কিছুক্ষণ পর উঁচু করল মাথা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঠোঁটে প্রশংসার হাসি ফুটে উঠেছে। 'লোকটা জানে আমি তার পিছু নিয়েছি,' আপনমনে বিড় বিড় করল সে। 'কিন্তু জানল কিভাবে? তারমানে জঙ্গলে তার আসা-যাওয়া আছে।' আবার ঝুঁকে দাগটা স্পর্শ করল সে। পানি থেকে উঠে এখানেই প্রথম পা ফেলেছিল রানা। দাগটা মুছে রেখে গেছে ও, ক্ষীণ আভাস রয়ে গেছে শুধু মোছার দাগটার–যা শুধু ওজি হাবিবের মত অভিজ্ঞ কোন লোকের চোখেই ধরা পড়ার কথা।

'হ্যাঁ, তুমি জানো আমি তোমার পিছু নিয়েছি।' মাথা ঝাঁকাল ওজি হাবিব। 'কিন্তু প্রায় একজন বামবুটির মত পায়ের ছাপ লুকানোর কৌশল কোত্থেকে শিখলে তুমি?'

মাটিথেকো হলুদ মেশিন বনভূমি সাফ করে যে চওড়া পথ তৈরি করেছে, সেই পথের ওপরই প্রথম রানার পায়ের ছাপ দেখতে পায় সে। ওখানে মাটি খুব নরম, বিদেশী লোকটা যে ছাপ রেখে এসেছে তা একজন অন্ধও অনুসরণ করতে পারবে। ওজি হাবিব বুঝতে পারে, পশ্চিম অর্থাৎ পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে সে–ঠিক যেমন চাখার সিং আন্দাজ করেছে।

ওজি হাবিব ধরে নেয়, রানা খুব সহজ একটা শিকার। ব্যাঙের কয়েকটা ছাতা ভাঙা দেখে তার আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। একবার চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারে সে, ওগুলো বিষাক্ত। ভাঙা একটা ব্যাঙের ছাতায় রানার দাঁতের ছাপও দেখতে পায় সে। আপনমনে হাসতে থাকে, বিড়বিড় করে বলে, 'তোমার বাপু পেটের অসুখ করেছে। জঙ্গলের ভেতর তুমি নদী বইয়ে দেবে।'

রাতে রানা যেখানে ঘুমিয়েছে, জায়গাটা খুঁজে বের করল ওজি হাবিব। ডায়রিয়া বাধাবার পর প্রথম যেখানে সাড়া দিল প্রকৃতির ডাকে, সে জায়গাটাও পেয়ে গেল পিগমি শিকারী। মনে মনে আওড়াল, 'এখন আর তুমি খুব বেশি দূর যেতে পারবে না। এবার তোমাকে ধরা পড়তে হবে, বাপধন। আর ওজি হাবিবের হাতে ধরা পড়া মানেই খতম।'

দ্রুত সামনে বাড়ছে সে, গভীর বনভূমির ছায়া আর নানা রঙের ভেতর ক্ষীণ একটু কালো ধোঁয়ার মত। ছাপগুলো অনুসরণ করছে রানার দ্বিগুণ বেগে। প্রকৃতির ডাকে আরও অনেক জায়গায় সাড়া দিয়েছে রানা, প্রায় সবগুলো দেখতে

পেল সে। পায়ের ছাপ তারপর পৌঁচেছে ছোট্ট একটা ঝর্ণার কিনারায়। পানিতে নেমে গেছে শিকার, তারপর আর কোন ছাপ নেই তার।

কোন বিরতি না নিয়ে প্রায় আধ বেলা খোঁজাখুঁজি করল ওজি হাবিব, জলাশয়ের দুই তীরের প্রতি ইঞ্চি মাটি পরীক্ষা করতে হলো তাকে, তারপর পেয়ে গেল ছাপগুলো। 'তুমি ভারি চালাক হে,' প্রশংসা করল সে। 'তবে ওজি হাবিবের মত নও।' আবার অনুসরণ করল সে, তবে এবার সতর্ক হয়ে আছে, এগোচ্ছে ধীর গতিতে। তার শিকার যে বুদ্ধিমান, এটা বোঝার পর বিপদের আশঙ্কা করছে সে। 'তোমাকে খুন করায় মজা আছে। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে এতক্ষণ হাল ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে যেত। কিন্তু আমি তো অন্য কেউ নই, স্বয়ং ওজি হাবিব।'

দ্বিতীয় দিন শেষ বিকেলে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছুল ওজি হাবিব, এই প্রথম দেখতে পেল তার শিকারকে। উল্টোদিকের পাহাড়ের নিচে প্রথমে ওটাকে একটা হরিণ বলে মনে করেছিল সে। উপত্যকার ওপর, প্রায় এক মাইল দূরে, গাছপালার ভেতর ক্ষীণ একটু কাঁপন মাত্র। ওজি হাবিবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও এক পলকের জন্যে ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিল। দেখে মনে হয়নি ওখানে কোন মানুষ নড়ে উঠল। বনভূমির কিনারায়, লম্বা গাছগুলোর আড়ালে হারিয়ে গেল আবছা মত কি যেন। হারিয়ে যাবার পর ওজি হাবিব উপলব্ধি করল, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাদায় ঢেকে নিয়েছে লোকটা, মাথায় পরেছে পাতা আর ডালের তৈরি হ্যাট, ফলে কাঠামো বা আকৃতি মানুষের সঙ্গে মেলে না।

'বারে বা!' উরুতে চাপড় মারল ওজি হাবিব, খানিকটা তামাক বের করে মুখে ভরল। 'ওস্তাদি ভালই জানো দেখছি। সন্ধের আগে তোমাকে ধরতে পারছি না বটে, তবে কাল সকালে তোমার মাথা আমি ঠিকই কাটব।'

রাতটা কাটাল ওজি হাবিব ফাঁকা জায়গাটার কিনারায়, যেখানে শেষবার দেখা গেছে রানাকে। কোন আগুন জ্বালল না সে। তারপর ভোরের আলো ফুটতেই আবার ধাওয়া শুরু করল।

কে বিশ্বাস করবে কিংবদন্তীর নায়ক মাসুদ রানা সদ্যজাত শিশুর মতই অসহায় ও অরক্ষিত হয়ে পড়েছে এই মুহূর্তে। ঘণ্টা দুয়েক অনুসরণ করার পরই ওকে পেয়ে গেল ওজি হাবিব। বর্বর পিগমিটা ওর সম্পর্কে বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানে না। তার কাছে রানা স্রেফ একটা সহজ শিকার মাত্র। কার নিয়তি কখন কোন দিকে বাঁক নেয়, কার মৃত্যু কিভাবে হয়, এ-সব আগে থেকে কারও পক্ষেই বলা সম্ভব নয়। রানাকে যারা চেনে তাদের মধ্যে অনেকে এমনকি উবোমোর নামও শোনেনি, তাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয় যে উবোমোর গভীর অরণ্যে এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছে ও যে বাধা দেয়া তো দূরের কথা, শত্রুর উপস্থিতি সম্পর্কেও ওর কোন ধারণাই নেই।

আকাশ-ছোঁয়া একটা আফ্রিকান মেহগনির নিচে শুয়ে রয়েছে রানা। প্রথমে ওজি হাবিবের মনে হলো, তার শিকার বোধহয় মারা গেছে। দূর থেকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে, দেখল তাকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে গাছের পাতা দিয়ে নিজেকে ঢাকার হাস্যকর চেষ্টা করেছে বিদেশী লোকটা।

খুব সাবধানে, একটু একটু করে সামনে বাড়ল ওজি হাবিব। তার ম্যাচেটির পাত খুব চওড়া, সেটা বাগিয়ে ধরে আছে ডান হাতে। সবরকম সাবধানতা অবলম্বন করছে সে, কোন রকম ঝুঁকি নিচ্ছে না। তার ম্যাচেটির ফলা ক্ষুরের মত ধারাল।

তারপর এক সময় রানার সামনে এসে পৌঁছুল সে, দেখল অসুস্থ হলেও এখনও মরেনি ও। জ্ঞান হারিয়েছে রানা, গলার ভেতর থেকে ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। অসুস্থ একটা কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে ও, গায়ে ছড়িয়ে রয়েছে গাছের পাতা। মাথাটা বাঁকা হয়ে রয়েছে একদিকে, ঘামে ধুয়ে গেছে চোয়ালের নিচের কাদা, স্পষ্টভাবে ফুটে রয়েছে সাদাটে একটা রেখা। রেখাটা ম্যাচেটির লক্ষ্যস্থল হতে পারে, দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করার জন্যে।

ম্যাচেটির ফলাটা আঙুলের ডগা দিয়ে পরীক্ষা করল ওজি হাবিব। এত ধার, এটা দিয়ে সে তার দাড়ি কামাতে পারবে। দু'হাতে ধরে মাথার ওপর তুলল ওটা। সাধারণত হরিণ শিকার করে সে, লোকটার গলা সেগুলোর চেয়ে মোটা নয়। ম্যাচেটির ফলা মাংস ও হাড় অনায়াসে ভেদ করে যাবে, ধড় থেকে লাফিয়ে ওঠার ভঙ্গিতে দূরে ছিটকে পড়বে মুণ্ডুটা। ঘন কালো চুল গাছের ডালে বাঁধবে সে, ঘণ্টাখানেক ঝুলিয়ে রাখবে, যাতে কাটা গলা থেকে সমস্ত রক্ত ঝরে যায়। তারপর সবুজ পাতা ও শিকড়ে আগুন ধরিয়ে, আগুনের ধোঁয়া লাগাবে ওটার গায়ে, তাহলে আর পচে যাবার ভয় থাকবে না। তার কাছে ছোট একটা জাল আছে, লতাপাতা দিয়ে তৈরি, সেটায় ভরে মুণ্ডুটা নিয়ে যাবে তার পোচিং মাস্টার চাথার সিং-এর কাছে। চাথার সিং তাকে পুরস্কার দেবে···।

ম্যাচেটিটা রানার গলার ওপর নামিয়ে আনবে এবার, দম বন্ধ করেছে, এই সময় ওজি হাবিবের মন একটু খারাপ হয়ে গেল। সে একজন সত্যিকার শিকারী বলেই হয়তো, খুন করার ঠিক আগের মুহূর্তে কেমন একটা বিষণ্ন ভাব জাগে তার মনে। যে পশুকে তারা হত্যা করবে, সেই পশুর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকতে হবে—তাদের গোত্রের এটা একটা প্রচলিত রীতি বা ঐতিহ্য—বিশেষ করে শিকার যদি সহজে হার না মানে, বা মূল্যবান হয়।

সহজে হার মানলেও ওজি হাবিবের আজকের শিকার অত্যন্ত মূল্যবান। যতটুকু বইতে পারবে তার দ্বিগুণ তামাক পাবে সে। 'বিদায়, বন্ধু। তাড়াতাড়ি মারা যাও!' প্রার্থনার সুরে বিড়বিড় করল ওজি হাবিব, আবার দম আটকাল, ম্যাচেটি নামিয়ে আনার জন্যে শক্ত করল পেশী।

তার পিছন থেকে শান্ত একটা গলা ভেসে এল, 'একটু থামো, ভাই। তা না হলে এই বিষাক্ত তীর তোমার লিভার ফুটো করে দেবে।'

চমকে উঠল ওজি হাবিব, লাফ দিল শূন্যে, ঘুরল আধপাক।

পাঁচ কদম সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোদাজি হাবিব। তার ধনুক বাঁকা হয়ে রয়েছে, তীরটা টেনে চোয়ালের কাছে নিয়ে গেছে, তীরের ডগায় টফির মত চকচক করছে কালো বিষ, সরাসরি ওজি হাবিবের বুকের দিকে তাক করা।

'তুমি আমার আপন ভাই!' বিস্ময়ে হাঁপাতে শুরু করেছে ওজি হাবিব।

'আমরা একই মায়ের পেট থেকে বেরিয়েছি। তোমার তীর আমার দিকে কিভাবে উড়ে আসবে?'

'মায়ের পেট থেকে আমরা দু'জন একই জিনিস বেরুইনি। আমাদের আপামণি এই বিদেশী লোকটাকে জীবিত উদ্ধার করে নিয়ে যেতে বলেছে। তার যদি এক ফোঁটা রক্তও তুমি ঝরাও, তীরটা তোমার বুক ফুটো করে শিরদাঁড়া ছুঁয়ে পিঠ দিয়ে বেরুবে।'

'লবণ মাখানো জোকের মত মোচড় খাবে তোমার শরীর,' লোদজি হাবিবের পিছন থেকে, বনভূমির ছায়ায় দাঁড়িয়ে বলল পারুমা, 'আমি তখন তোমাকে ঘিরে তা ধিন তা ধিন নাচব আর গাইব।'

তাড়াতাড়ি পিছু হটল ওজি হাবিব। সে জানে, ভাইকে বোকা বানানো তেমন কঠিন নয়, কিন্তু পারুমা বিপজ্জনক ও কঠিন পাত্রী। ভাবীকে তো সে ভয় করেই, ভয় মেশানো খানিকটা শ্রদ্ধাও করে। 'এই লোককে শিকার করতে পারলে অনেক পুরস্কার পাব আমি,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল সে। 'যত তামাক বইতে পারব, তার দ্বিগুণ। ঠিক আছে, অর্ধেকটা তোমরা নিয়ো···।'

'দেরি কোরো না গো, তোমার ভাইকে তীর মারো,' মিনতির সুরে আবেদন জানাল পারুমা। 'প্রথমে মারো পেটে, মরতে যাতে খানিকটা সময় নেয়—হুট করে মরে গেলে নেচে আমি একটুও মজা পাব না।'

'তুমি বলছ, তীর ছুঁড়ব?' ধনুক টেনে রাখায় হাত কাঁপছে লোদজি হাবিবের, এক চোখ বন্ধ করে লক্ষ্যস্থির করল সে।

'দাঁড়াও!' আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওজি হাবিবের গলা থেকে। 'ভাবী, আমার প্রিয় ভাবী, আমি তোমাকে ভালবাসি! আমার এই বোকা ভাইটাকে থামতে বলো। তোমার প্রিয় দেবরকে বাঁচাও!'

'নাকে নস্যি নিচ্ছি,' ঠাণ্ডা সুরে বলল বুড়ি। 'একটা হাঁচি দেব। হাঁচির পর যদি দেখি তুমি আছো, তাহলে আমার কিছু করার থাকবে না···।'

'চলে যাচ্ছি,' তাড়াতাড়ি বলল ওজি হাবিব, দশ পা পিছাল। 'এখুনি চলে যাচ্ছি আমি!' একটা ঝোপের আড়ালে লুকাল সে। তীরটা এখন তার দিকে তাক করা নয়, দেখেই গালাগাল শুরু করল সে, 'তোর মুখে পেচ্ছাব করি আমি, বুড়ি মাগী···।'

প্রচণ্ড হতাশায় ও রাগে ম্যাচেটি দিয়ে ঝোপ-ঝাড় কাটছে ওজি হাবিব, শুনতে পেল ওরা। এখনও তার গলা ভেসে আসছে, 'লোদজি একটা ঘেয়ো কুত্তীকে বিয়ে করেছে···।' ধীরে ধীরে তার গলার আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল। তীর নামিয়ে স্ত্রীর দিকে ফিরল লোদজি হাবিব।

'আজ যে রকম আনন্দ পেলাম, এরকম আনন্দ আরেকদিন পেয়েছিলাম,' বুড়িকে বলল সে। 'মোষ ধরার জন্যে একটা ফাঁদ তৈরি করেছিল ওজি। মোষটা ঠিকই পড়ল খাদের ভেতর, তবে ওটার পিঠে সে নিজেও পড়ল।' মাথা চুলকাল বুড়ো। 'তবে একটা কথা স্বীকার করতে হবে, তোমার একেবারে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে সে।'

অন্য সময় হলে কি ঘটত বলা যায় না, তবে এই মুহূর্তে স্বামীর কথায়

কান না দিয়ে রানার দিকে এগোল বুড়ি। ধুলো আর পাতার মধ্যে অর্ধেক ডুবে রয়েছে রানা, জ্ঞান নেই। ওর পাশে হাঁটু গাড়ল পারুমা, দ্রুত অথচ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ওকে—নাকের ফুটো ও চোখের কোণ থেকে দু'আঙুলে ধরে তুলে আনল কয়েকটা পিঁপড়ে। 'আপামণির জন্যে একে বাঁচাতে হবে,' বিড় বিড় করল সে। 'মানুষের কি আর দাম, একটা মরলে আরেকটা পাওয়া যায়। কিন্তু মনের মানুষ মরলে আর পাওয়া যায় না। এটাকে যদি মরতে দিই, আপামণির মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

পাঁচ

রানার চারপাশে গাছের ডাল পুঁতে দেয়াল তৈরি করল লোদজি হাবিব, ডালেরই একটা ফ্রেম তৈরি করে দেয়ালগুলোর ওপর তুলে ঢেকে দিল পাতা দিয়ে। তারপর শীত আর মশা তাড়াবার জন্যে রানার পাশে আগুন জ্বালল সে। দোরগোড়ায় বসে স্ত্রীর কাজ দেখছে এখন।

লতাপাতা ও গাছের শিকড় দিয়ে ওষুধ বানায় পারুমা, বামবুটিরা বিশ্বাস করে তার ওষুধে কাজ হতেই হবে। প্রথমে রানার পিঠের ক্ষতটা পরিষ্কার করল সে, তারপর সেদ্ধ করা পাতা ও শিকড় বেটে মলম তৈরি করে লাগাল। ফুটন্ত পানিতে শুকনো পাতা ফেলল, সেই পানি ঠাণ্ডা হবার আগেই প্রায় জোর করে খেতে বাধ্য করল রানাকে। জ্ঞান না ফিরলে কি হবে, কাজ করার সময় ওকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে বুড়ি। মাঝে মধ্যে ঝুঁকে পরীক্ষা করছে ওকে, রানার গালে ঠেকে যাচ্ছে নগ্ন ও ঝুলে পড়া শুকনো স্তন। তার গলায় একটা হার রয়েছে, আইভরি আর পুঁতি দিয়ে তৈরি, নড়াচড়ার সময় টুন টুন শব্দ করছে সেগুলো।

তিন ঘণ্টা পর জ্ঞান ফিরল রানার। ঘরের ভেতর ধোঁয়া, ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখল দু'জন জংলী মানুষ ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে। সোয়াহিলি ভাষায় জিজ্ঞেস করল ও, 'তোমরা···?'

'আমি লোদজি হাবিব,' বলল বুড়ো। 'বিখ্যাত শিকারী এবং বীর-বামবুটি বীর।'

'আর আমি পারুমা, উবোমো অরণ্যের সবচেয়ে কুখ্যাত মিথ্যুকটার বউ,' বলেই হি হি করে হেসে উঠল বুড়ি।

পরদিন সকালে ডায়রিয়া প্রায় ভাল হয়ে গেল রানার। বানরের মাংস দিয়ে রান্না করা ঝোল খেতে দেয়া হলো ওকে। ভেষজ ওষুধও খানিক পর পর ঢেলে দেয়া হলো গলায়। আরও একদিন কাটল, পিঠের ক্ষতটায় টান ধরল সামান্য, আগের মত আর দুর্বল বোধ করছে না। ওকে নিয়ে গোনডালার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল লোদজি হাবিব আর পারুমা।

প্রথম দিকে খুব ধীরে ধীরে এগোল রানা, হাতে ছড়ি থাকলেও মনে হলো

পড়ে যাবে। ওর পাশে সারাক্ষণ সতর্ক থাকল পারুমা, যদিও তার বকবকানি মুহূর্তের জন্যেও থামল না। সব সময় ওদের সামনে থাকল লোদজি হাবিব, ওদেরকে পথ দেখাল, সুযোগ পেলে শিকারও করল।

ইতিমধ্যে পারুমা তার আপামণি সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়েছে রানাকে। সেই আপামণির নির্দেশেই তারা ওকে উদ্ধার করতে এসেছে। আপামণিটা কে হতে পারে, আন্দাজ করে নিয়েছে রানা।

সন্ধের খানিক আগে আবার উদয় হলো লোদজি হাবিব, পিঠে শিকার করা একটা হরিণ ঝুলছে। রাতে ওরা হরিণের লিভার পুড়িয়ে খেল। পরদিন সকালে হাতের ছড়িটা ফেলে দিল রানা, ওটার সাহায্য ছাড়াই হাঁটতে পারবে এখন। এরপর হাঁটার গতিও আগের চেয়ে অনেকটা বাড়ল ওর।

পরদিন বিকেলে গোনডালায় পৌঁছুল ওরা। পিগমি বুড়ো-বুড়ি আগে থেকে কিছু জানায়নি, ফলে হঠাৎ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে গেল রানা। সামনের দৃশ্যটাকে মনে হলো অবাস্তব ও স্বপ্ন। সুন্দর, সাজানো একটা আদর্শ গ্রাম যেন জায়গাটা। এক পাশে রয়েছে একটা ঝর্ণা, আরেক পাশে খোলা বাগান, পিছনে বরফ ঢাকা উঁচু পাহাড়।

'রানা!' ধাপ বেয়ে বারান্দায় উঠছে ওরা, একটা কামরা থেকে বেরিয়ে এল মনিকা। রানাকে দেখে একটুও আশ্চর্য হয়নি সে। পারুমা আর লোদজি হাবিব রানার খোঁজে বেরিয়ে যাবার পর সে-ও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেনি, একটা রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। দু'জোড়া পায়ের ছাপ অনুসরণ করে সে, জানত না ওগুলো পারুমা আর লোদজি হাবিবের। ওরা যখন রানাকে দেখতে পায়, প্রায় একই সময়ে জঙ্গলের আরেক কিনারা থেকে সে-ও ওকে দেখতে পেয়েছিল, বোধহয় কয়েক মুহূর্ত আগেই। কোন কারণে লোদজি হাবিব তীর ছুঁড়তে দেরি করলে, মনিকার রাইফেলের গুলি ওজি হাবিবের খুলি উড়িয়ে দিত। লোকটা পালাবার পর পারুমা বুড়ি রানার যত্ন নিচ্ছে দেখে, একাই আবার নিজেদের ডেরায় ফিরে এসেছে সে। জানত, ওদের হাতে নিরাপদেই থাকবে রানা। কোন সন্দেহ নেই, তার এরকম আচরণের পিছনে অভিমানের একটা ভূমিকা আছে। 'রানা!' তার গলায় বিস্ময় নয়, আনন্দের সুর ধরা পড়ল।

রানার ধারণা ছিল মনিকাকেই দেখতে পাবে, তবু হঠাৎ এভাবে দেখতে পাবার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। ভাল লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। সামনে তাজা একটা ফুল, সুন্দর ও আকর্ষণীয়। তবে এগিয়ে এসে ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করার সময় মনিকার হাব-ভাবে একটা সতর্ক ভাব লক্ষ করল রানা। ওর হাতটা ছেড়ে দিয়ে এক পা পিছাল সে। বলল, 'গড, কি চেহারা হয়েছে তোমার! কি ঘটেছিল বলো তো?'

'প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ,' বলল রানা, ঠোঁট টিপে হাসল। 'কি ঘটেছিল মানে? বলো কি ঘটেনি!'

'এসো, ক্লিনিকে এসো। আগে তোমাকে পরীক্ষা করি।'

'প্রথমে গোসল করা দরকার না? আমি নিজেই নিজের পাশে টিকতে পারছি না।'

হেসে উঠল মনিকা। 'তোমার নাক! এসো, কিছু আসে যায় না, তোমার গন্ধ আমি চিনি--কোনদিন বলিনি খারাপ লাগে!'

ক্লিনিকে নিয়ে এসে রানাকে টেবিলে শুইয়ে দিল মনিকা। পিঠের ক্ষতটা পরীক্ষা করে বলল, 'যা করার পারুমাই করে রেখেছে, আমি শুধু তোমাকে একটা অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দেব। একটা ব্যাণ্ডেজও লাগবে, তবে গোসল করার পর। সেলাই করা উচিত ছিল, তবে এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'ধন্যবাদ।'

'আরও অনেক পুরানো দাগের সঙ্গে নতুন একটা যোগ হলো তোমার শরীরে,' বেসিনে হাত ধোয়ার সময় বলল মনিকা। 'দেখে মনে হলো, কারো সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে তোমার।'

'আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ,' মনিকাকে আশ্বস্ত করল রানা। 'আমার রাশিটাই বোধহয় খারাপ, মানুষ হয় আমাকে মেরে ফেলতে চায় নয়তো কোন কারণ ছাড়াই রাগ করে দূরে সরে যায়। এই যেমন তুমি--শেষবার যখন দেখা হলো, তুমি আমাকে কিছু ব্যাখ্যা করারও সুযোগ দিলে না। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি মোটর সাইকেল ছেড়ে দিয়েছ···।'

'জানি। এই রাগ আমি আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছি।'

'ব্যাপারটা কি এখন আমি ব্যাখ্যা করতে পারি?'

'তার আগে গোসল করে নিলে হয় না?'

বেড়া দিয়ে ঘেরা বেশ বড় বাথরুম, ক্যাম্পের চাকরবাকররা গরম পানি রেখে গেছে। ওর জন্যে কাপড়ের ব্যবস্থাও করেছে মনিকা--খাকি শর্টস আর শার্ট, সদ্য ইস্ত্রি করা। চামড়ার তৈরি একজোড়া স্যাণ্ডেলও পেয়ে গেল রানা। কাদা মাখা বুট আর রক্ত মাখা শর্টস একজন চাকর এসে নিয়ে গেল।

সার্জারিতে ফিরে এসে রানা দেখল ওর জন্যে অপেক্ষা করছে মনিকা। 'বাহ্, কি পরিবর্তন!' হেসে উঠল মনিকা। 'এসো, পিঠটা মেরামত করি।'

একটা চেয়ারে বসল রানা, ওর পিছনে দাঁড়াল মনিকা। মেয়েলি আঙুলের নরম ছোঁয়া ঠাণ্ডা লাগল রানার। কথা বলার সময় নাকে তার গায়ের গন্ধ ও নগ্ন ঘাড়ে নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেল। 'আমাকে উদ্ধারের জন্যে পিগমিদের পাঠিয়েছিলে, সেজন্যে এখনও তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া হয়নি,' বলল ও।

'বলতে পারো রুটিন ওঅর্ক,' হাসি চেপে বলল মনিকা। 'এখানে এরকম অনেককেই বাঁচাবার চেষ্টা করছি আমরা। ভুলে যাও।'

'আমি তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকলাম।'

'ঋণ শোধ করার প্রস্তাব পাবে, তৈরি থেকো।'

'পারুমার বর্ণনা শুনে তোমার কথাই মনে হয়েছিল আমার। এ-দেশে তুমি ঢুকলে কিভাবে বলো তো? এখানে তুমি করছটাই বা কি? সিমন সাফারি তোমাকে পেলে সামরিক অফিসারদের টার্গেট প্র্যাকটিস করার নির্দেশ দেবে, তা জানো?'

'ও, আচ্ছা! তার মানে সিমন সাফারি সম্পর্কে তোমার মোহ তাহলে ভেঙেছে! তুমি তো তাকে দেবতা বলে ধরে নিয়েছিলে!'

'আবার লাগবে মনে হচ্ছে! এখনও আমি খুব দুর্বল, নিজেকে রক্ষা করতে পারব না।'

'একটা গণ্ডারের মত দুর্বল তুমি। এত সব পেশী কি বলে? বেশ, বাদ দাও—এসো, এবার ইঞ্জেকশনটা দিই তোমাকে। বিছানায় শুয়ে কোমর থেকে শর্টস নামাও।'

'অ্যাঁ! হাতে দিতে অসুবিধে কি?'

'আগে দেখিনি এমন কিছু নেই তোমার। টেবিলে শোও বলছি।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে টেবিলে উঠে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা, কোমর থেকে অর্ধেকটা নামিয়ে আনল শর্টস।

'বেশ ভাল আকৃতি, লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই,' রানাকে আশ্বস্ত করল মনিকা, সুইটা ঘ্যাঁচ করে ঢুকিয়ে দিল মাংসের ভেতর। 'ব্যস, হয়ে গেল। কাপড় পরে ডিনারে বসবে চলো। তোমার জন্যে আরও একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে। ডিনারে তোমার সঙ্গী হবেন এক ভদ্রলোক—অনেক বছর তাঁকে তুমি দেখনি।'

সূর্য ডুবছে, ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে ফাঁকা জায়গাটুকু পেরোল ওরা, চলে এল লিভিং কোয়ার্টারে। পথে একবার থামল রানা, চাঁদের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে সূর্যাস্ত দেখল। রানার পাশ থেকে মনিকা ফিসফিস করে বলল, 'এই সৌন্দর্য আমি সারাজীবন স্মৃতিতে ধরে রাখব।' রানার হাত ধরে মৃদু চাপ দিল সে।

মনিকার বাংলোয় ডিনারের আয়োজন। বারান্দায় লম্বা একটা টেবিল ফেলা হয়েছে। টেবিলে বসে আছেন নিঃসঙ্গ এক ভদ্রলোক। ওদেরকে আসতে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন তিনি। 'মি. মাসুদ রানা! হাউ গুড টু সী ইউ এগেন!'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর দ্রুত এগোল ভদ্রলোকের দিকে। 'কিন্তু আমি শুনেছি আপনি মারা গেছেন, মি. প্রেসিডেন্ট! আমাকে বলা হয়েছে হয় আপনি হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন, নয়তো সিমন সাফারি আপনাকে গুলি করে মেরেছেন।'

'গুজবে কান দিতে নেই,' হাসিমুখে বললেন ড. শেখ ফাহিম ফয়সল, রানার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে ঝাঁকালেন।

'আমার মেডিকেল চেস্টে একটা হুইস্কির বোতল পেয়েছি,' বলল মনিকা। 'আজ রাতে ওটা সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে।' তিনটে গ্লাসে অল্প করে হুইস্কি ঢালল সে। যে যার গ্লাস তুলে নিয়ে উঁচু করে ধরল। 'উবোমোর শুভ কামনায়! অত্যাচারীর হাত থেকে দেশটা যেন শিগগির মুক্তি পায়।'

নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, আর বাগানে আছে তাজা তরি-তরকারি—সে-সবই রান্না করা হয়েছে। কিভাবে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাঁকে উৎখাত করা হলো, খেতে খেতে তার একটা বর্ণনা দিলেন ড. শেখ ফাহিম ফয়সল। বললেন এখানে তিনি কিভাবে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলেন। জানালেন, সিমন সাফারির বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাচ্ছেন তাঁরা। সবশেষে বললেন, 'মনিকার সাহায্যে গোনডালাকে হেডকোয়ার্টার বানিয়ে সিমন সাফারির ডিকটেটরশিপ-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি আমি।'

তিনি থামতেই মনিকা বলল, 'মি. প্রেসিডেন্ট, ক্ষমতা দখলের পর সিমন

সাফারি দেশটাকে নিয়ে কি করছেন রানাকে জানান। ওর জানা দরকার, কারণ সাফারির পক্ষ নিয়ে উবোমোর ফিচার ফিল্ম তৈরি করতে এসেছে ও···।'

'না, মনিকা,' বাধা দিল রানা। 'আসলে তা সত্যি নয়। ব্যাপারটা আরও জটিল। এখানে ছবি তোলার প্রস্তাবে প্রথমে আমি ব্যক্তিগত কারণে রাজি হই।' আলী শাহ ও তার পরিবারের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বলল ও। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে চঙমণ্ড গড কিভাবে জড়িত তা-ও ব্যাখ্যা করল। ব্যাখ্যা করল চাখার সিং-এর ভূমিকা। 'প্রথম যখন এলাম, সিমন সাফারি বা উবোমোর সমস্যা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাইনি। আমি আসলে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম। ছবি তোলার প্রস্তাবটা গ্রহণ করার সেটাই একমাত্র কারণ ছিল। তারপর ধীরে ধীরে জানতে পারি উবোমোয় আসলে কি ঘটছে···।' ফিশ ঈগল বে-র ঘটনাটা ওদেরকে জানাল রানা।

ড. ফাহিম ফয়সল ও মনিকা দৃষ্টি বিনিময় করল। রানার দিকে ফিরে ভদ্রলোক বললেন, 'মাইন আর লগিং ক্যাম্পে ত্রিশ হাজার উহালিকে ধরে নিয়ে গেছে সিমন সাফারি। মানবেতর জীবনযাপন করছে তারা। আক্ষরিক অর্থেই ক্রীতদাস বানিয়ে রাখা হয়েছে। পোকামাকড়ের মত মারা যাচ্ছে তারা—কেউ খাবার না পেয়ে, কেউ গুলি খেয়ে।'

'গাছ কেটে বন উজাড় করে ফেলছেন সিমন সাফারি,' বলল মনিকা। 'এরই মধ্যে কয়েক মিলিয়ন একর রেইন ফরেস্ট নষ্ট করে ফেলেছেন···।'

'মাইনিং ইউনিট কিভাবে কাজ করছে আমি দেখেছি,' বলল রানা। 'দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সাবধানে ব্যবহার করলে ক্ষতিটা প্রকৃতিই আবার পূরণ করে দেয়···।'

চোখে অবিশ্বাস, দু'জনেই ওরা রানার দিকে তাকিয়ে থাকল। 'তুমি কি পাগল হলে, রানা? সিমন সাফারির আচরণ তুমি সমর্থন করছ? উনি স্রেফ রেপ করছেন প্রকৃতিকে। তুমি দেখছি সত্যি বদলে গেছ, রানা! তোমার সম্পর্কে আমার প্রথম ধারণাটাই তাহলে ঠিক ছিল···।'

'থামো, মনিকা!' একটা হাত তুলে বাধা দিলেন ড. ফাহিম ফয়সল। 'মাথা ঠাণ্ডা করো। মি. রানাকে বলতে দাও কি দেখেছেন তিনি।'

চুপ করল বটে, তবে মনিকার চোখ দুটো থেকে আগুন ঝরছে। 'ঠিক আছে, মাসুদ রানা, সিমন সাফারি কি দেখিয়েছেন তোমাকে শোনাও আমাদের···।'

'মোমু ইউনিট কিভাবে কাজ করে···,' শুরু করল রানা।

'মোমু ইউনিট? মোমু ইউনিটগুলো নয়?' চিৎকার করে জানতে চাইল মনিকা।

'প্লীজ, মনিকা!' আবার বাধা দিলেন ড. ফাহিম ফয়সল। 'মি. রানাকে শেষ করতে দাও!'

আবার চুপ করল মনিকা, উত্তেজনায় ও রাগে হাঁপাচ্ছে সে।

'সোফিয়া আর আমি মোমু কিভাবে কাজ করে তার ছবি তুললাম,' বলল রানা। 'সিমন সাফারি ব্যাখ্যা করলেন মোমু মাটি কাটার পর কিভাবে আবার খাদ ভরা হবে, তারপর সেখানে নতুন করে গাছের চারা লাগানো হবে···।'

'মাই গড়!' তোমাকে বোকা বানিয়েছেন সিমন সাফারি!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিল মনিকা। 'তিনি কি বলেছেন যে কয়েক হপ্তা ধরে প্ল্যাটিনাম পরিশোধনের কাজে কেমিক্যাল রিএজেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে, মোমুর টিউব মিল থেকে বেরুবার সময়?'

'না।' মাথা নাড়ল রানা। 'তিনি বরং বলেছেন, কোন রিএজেন্ট বা ক্যাটালিস্ট ব্যবহার করা হবে না।'

'আর তুমি তাঁর কথা বিশ্বাস করেছ?'

'বিশ্বাস না করার কি আছে, নিজের চোখেই তো দেখলাম সব···।'

লাফ দিয়ে টেবিল ছাড়ল মনিকা, পাশের কামরা থেকে একটা ম্যাপ নিয়ে এল। রানার সামনে মেলে ধরল সেটা। 'দেখাও আমাকে, কোথায় কাজ করছে মোমু?'

ম্যাপে চোখ রেখে কিছুক্ষণ খুঁজল রানা, তারপর এক জায়গায় আঙুল রাখল। 'এখানে। ক্যাম্প থেকে কয়েক মাইল উত্তরে।'

'বোকা!' রানার দিকে ঝুঁকে মুখে ঝড় তুলল মনিকা। 'সিমন সাফারি তোমাকে গাধা বানিয়েছেন। তিনি তোমাকে পাইলট স্কীম দেখিয়েছেন। গোটা ব্যাপারটার আয়োজন করা হয়েছে শুধু তোমাকে বোকা বানাবার জন্যে।' ম্যাপের গায়ে আরও পঞ্চাশ মাইল দূরে আঙুল রাখল সে। 'এখানে, এই ওয়েঙ্গুতে চলেছে আসল অপারেশন। এখানে গোটা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম···।'

'অন্যরকম মানে?' রানার গলায় ঝাঁঝ। 'দেখো, কেউ আমাকে বোকা বলুক এটা আমার পছন্দ নয়।'

'তুমি যথেষ্ট সতর্ক ছিলে না,' গলার আওয়াজ আগের চেয়ে নরম করল মনিকা। 'ওখানে কি চলছে শোনো তাহলে···।'

'থামো, মনিকা,' বাধা দিলেন ড. ফাহিম ফয়সল। 'এখুনি ওঁকে কিছু বোলো না। তোমার কথা উনি ভালভাবে বুঝতে পারবেন যদি নিজের চোখে দেখেন···।'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে মনিকা বলল, 'চমৎকার! ধন্যবাদ, ড. ফয়সল। ওকে ওয়েঙ্গুতে নিয়ে যাব, নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে। চলো, রানা—যেজন্যে সিমন সাফারি আসলে কি করছেন তার ছবি তুলবে তুমি। তোমার প্রিয় বন্ধু স্যার ট্যাফোর্ডের কীর্তিও চাক্ষুষ করার সুযোগ হবে তোমার···।'

রানা বলল, 'কিন্তু আমি ঠিক ক্যামেরাম্যান নই···।'

'ক্যামেরাম্যান নও তো কি হয়েছে? এতদিন ধরে ফিল্ম তৈরি করছ, চালাতে তো জানোই।'

'বেশ, জানি। কিন্তু এই জঙ্গলের মাঝখানে কোথায় তুমি ভিটিআর ইকুইপমেন্ট পাবে, শুনি?'

'তোমার বান্ধবী সোফিয়া যেটা ব্যবহার করছিল, সেটা কোথায়?' জানতে চাইল মনিকা।

প্রতিবাদ করল রানা, 'সোফিয়া আমার বান্ধবী নয়। তোমার শুধু কথায় কথায় অভিযোগ।'

'আমি জানতে চাইছি তোমাদের ভিটিআর কোথায়?'

'ল্যাণ্ডরোভারে ফেলে রেখে এসেছি,' বলল রানা। 'সিমন সাফারির লোকজন এখনও যদি ওটা খুঁজে না পেয়ে থাকে, ওখানেই আছে সেটা।'

'সেক্ষেত্রে ফিরে যাচ্ছো তুমি,' বলল মনিকা। 'ওগুলো নিয়ে আসছ। তোমার সঙ্গে আমি লোদজি হাবিবকে পাঠাব।'

'আপনার কথা মত বিদেশী জানোয়ারের মুণ্ডু এনেছি আমি,' নাটকীয় সুরে ঘোষণা করল শিকারী ওজি হাবিব, কাঁধ থেকে জালটা নামিয়ে ফেলে দিল পায়ের কাছে।

জাল থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গড়িয়ে গেল মাথাটা। লাফ দিয়ে পিছু হটল চাখার সিং, বিকৃত হয়ে উঠল তার চেহারা, তাকিয়ে আছে মানুষের মাথাটার দিকে। মাথায় চামড়া বলতে কিছু নেই। কাঁচা মাংসে পচন ধরেছে, দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এল। 'কি করে বুঝব এটা সেই লোকের মাথা?' জানতে চাইল সে।

'আমি, ওজি হাবিব বলছি, কাজেই বিশ্বাস করতে হবে আপনাকে।'

'ইউ আর আ লায়ার, নেভার মাইণ্ড!' ইংরেজিতে বলল চাখার সিং। তারপর সোয়াহিলি ভাষায় বলল, 'এই লোকটা অনেক দিন আগে মারা গেছে। পিঁপড়ে আর পোকায় খেয়ে ফেলেছে তার অর্ধেকটা। তুমি তাকে মারোনি, ওজি হাবিব।'

'না,' স্বীকার করল ওজি হাবিব। 'বোকা লোকটা বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা খেয়েছিল, আমি তাকে খুঁজে পাবার আগেই মরে ভূত হয়ে গেছে। পিঁপড়েগুলো তাকে খেয়েছে, সত্যি বটে, তবে তার মাথাটা আমি আপনার কাছে ঠিকই এনেছি। এই কাজটাই আপনি আমাকে দিয়েছিলেন।' চাখার সিং-এর সামনে হাত পাতল সে। 'এবার আমাকে পুরস্কার দিন। বিশেষ করে প্রথমে আমি তামাক চাই।'

প্রায় মিথ্যে একটা আশা, ওজি হাবিব জানে। মাথাটা সংগ্রহ করার জন্যে কবরস্থানে অভিযান চালাতে হয়েছে তাকে। লগিং ক্যাম্পে ক্রীতদাসরা মারা যাচ্ছে গুলি খেয়ে, তাদেরকে হিটা সৈনিকরা চুপিচুপি মাটি চাপা দেয়, সেই মাটি খুঁড়ে একটা লাশ চুরি করতে হয়েছে তাকে।

'তুমি ঠিক জানো এ সেই বিদেশী লোকটার মাথা?' কড়া সুরে জিজ্ঞেস করল চাখার সিং। ওজি হাবিবের কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তার। তবে তার নিজের সমস্যা হলো, চণ্ডমণ্ড গণ্ড ও প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারিকে সন্তুষ্ট করতে হবে। রানা সম্ভবত পালিয়ে গেছে, এ আশঙ্কার কথা কোনভাবেই তাঁদেরকে শোনানো যাবে না। ওজি হাবিব তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার সহজ একটা উপায় দেখিয়ে দিচ্ছে।

'অবশ্যই এ সেই লোক,' জোর দিয়ে বলল ওজি হাবিব। 'তা না হলে মাথাটা এত কষ্ট করে কেন আমি নিয়ে আসব!'

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর চাখার সিং বলল, 'নিয়ে যাও এটা।' জুতোর ডগা দিয়ে কাটা মাথাটায় খোঁচা দিল সে। 'নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে কোথাও পুঁতে ফেলো।'

'কিন্তু আমার পুরস্কার? বিশেষ করে তামাক?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইল ওজি হাবিব।

'তুমি গোটা মাথাটা আনতে পারনি। চামড়া নেই, চুলও নেই। কাজেই সবগুলো পুরস্কার তোমার পাওনা হয়নি। দেব, সবই দেব, তবে আগে তুমি হাতির দাঁতগুলো নিয়ে এসো।'

হঠাৎ দুর্বোধ্য চিৎকার বেরিয়ে এল ওজি হাবিবের গলা থেকে, এক টানে কোমর থেকে ম্যাচেটি নামাল সে।

'হাতের ওটা সরিয়ে রাখো,' চাখার সিং বলল। 'তা না হলে গুলি করে আমি তোমার খুলি উড়িয়ে দেব।' ওজি হাবিবকে একটা টোকারেভ পিস্তল দেখাল সে, তার বুশ জ্যাকেটের ভেতর লুকানো রয়েছে।

খিকখিক করে হাসল ওজি হাবিব। 'সামান্য একটু ঠাট্টা করলাম, প্রভু। আমি তো আপনার বিশ্বস্ত চাকর।' কোমরের খাপে ম্যাচেটিটা ভরে রাখল সে। 'আপনার আদেশ মাথায় নিয়ে জঙ্গলে ফিরে যাচ্ছি আবার। হাতির দাঁত নিয়ে আসব।' বিচ্ছিন্ন মাথাটা তুলে জালে ভরল সে, জালটা ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। দ্বিতীয়বার চাখার সিং-এর দিকে না তাকিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল সে।

একা হতেই আবার কোমর থেকে ম্যাচেটি বের করল ওজি হাবিব। সামনে ঝোপ-ঝাড় যা পেল সব কেটে ফেলছে। 'ওজি হাবিবকে কেউ ঠকাতে পারে না!' আপনমনে বিড়বিড় করছে সে। 'কেউ ঠকালে ওজি হাবিব তাকে খুন করে। তুমি আমার কাছে একটা মাথা চেয়েছ, বিদেশী কুত্তা! ঠিক আছে, তোমাকে একটা মাথা উপহার দেব আমি। তোমার নিজের মাথা।'

'মাসুদ রানা মারা গেছে,' ওদেরকে বলল চাখার সিং। 'বামবুটি শিকারী তার মাথা নিয়ে এসেছিল। জঙ্গলে মারা গেছে সে।'

'কোন সন্দেহ নেই তো?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি।

'কোনই সন্দেহ নেই,' তাঁকে আশ্বস্ত করল চাখার সিং। 'আমি নিজের চোখে মাথাটা দেখেছি।'

'এখন তাহলে জীবিত সাক্ষী বলতে শুধু ওই মেয়েটা,' বললেন চন্ডমন্ড গন্ড, চেহারায় স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল। 'আপনার উচিত এখুনি তার একটা ব্যবস্থা করা, ইওর এক্সেলেন্সী। মেয়েটাও জঙ্গলে হারিয়ে গেলে ভাল হয়, ঠিক মি. মাসুদ রানার মত।'

খালি গ্লাসটা তুলে নিয়ে ঝাঁকালেন সিমন সাফারি, বরফের টুকরোগুলো আওয়াজ তুলল। কামরার আরেক প্রান্ত থেকে ছুটে এসে তাঁর হাত থেকে গ্লাসটা চেয়ে নিল ক্যাপটেন সোল। কামরার আরেক দিকে ছোট একটা বার রয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে গ্লাসটায় হুইস্কি ভরল সে।

'ভিডিও টেপটার কথা ভুলে যাওয়া কি উচিত হচ্ছে?' জানতে চাইলেন সিমন সাফারি, ক্যাপটেন সোলের বাড়িয়ে ধরা হাত থেকে গ্লাসটা নিলেন।

'না, ভুলছি না,' বললেন চন্ডমন্ড গন্ড। 'দূতাবাস থেকে ওটা উদ্ধার করে

আনার পরপরই মেয়েটাকে সরিয়ে ফেলতে হবে।' এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন তিনি, তারপর আবার বললেন, 'আপনি বললে আমি ব্যক্তিগতভাবে তার ব্যবস্থা করতে পারি।'

গ্লাসের কিনারা থেকে চন্ডমন্ড গন্ডের দিকে তাকিয়ে আছেন সিমন সাফারি। ঠোঁটে মুচকি হাসি। 'ও, হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'আমি শুনেছি আপনার একটা অদ্ভুত শখ আছে নারীদের নিয়ে।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কি বোঝাতে চাইছেন, মি. প্রেসিডেন্ট।' আড়ষ্ট হয়ে গেছেন চন্ডমন্ড গন্ড। 'আমি শুধু প্রস্তাব দিচ্ছি কাজটা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। কোন সুতো আলগা রেখে দেয়া উচিত হবে না।'

'ঠিক বলেছেন, মি. গন্ড,' একমত হলেন সিমন সাফারি। 'মেয়েটা একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। তার ওপর আমার আর কোন আগ্রহ নেই। টেপটা উদ্ধার হবার পর তাকে আপনার হাতে তুলে দেয়া হবে। শুধু লক্ষ রাখবেন, কোথাও যেন কোন ভুল না হয়।'

'আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনি যেমন আমাকে বিশ্বাস করেন, আমিও ঠিক তেমনি আপনাকে বিশ্বাস করি। আমরা পার্টনার, তাই না?'

'রানার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, ও নিজে এসে টেপটা নিয়ে যাবে,' স্যার মাইকেল ডাফ বলল, হাতের নখগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছে। তারপর জানালার সামনে দাঁড়াল সে, নিজের অফিস কামরা থেকে ব্রিটিশ দূতাবাসের উঠনটা দেখল। 'আমার পজিশন আপনাকে বুঝতে হবে, মিস··· মিস সোফিয়া।'

খালি হাতে সিমন সাফারির কাছে ফিরে গেলে কি ঘটতে পারে কল্পনা করে শিউরে উঠল সোফিয়া। যেমন করে হোক টেপটা নিয়ে যেতে হবে তাকে। আবার এ-ও সত্যি, বেশি আগ্রহ দেখালে আরও সাবধান হয়ে যাবে মাইকেল ডাফ। 'এ-ধরনের কোন সমস্যা হতে পারে, আমি ভাবিনি।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। 'রানার উচিত ছিল আমাকে একটা নোট দিয়ে পাঠানো। আমিও চাইনি, কারণ টেপটার তেমন কোন গুরুত্ব আছে বলে আমার জানা নেই। যাই হোক, আপনি সময় দিয়েছেন বলে ধন্যবাদ, স্যার মাইকেল। রানা হয়তো আমার ওপর রাগ করবে, তবে কেন আপনি আমাকে বিশ্বাস করেননি বুঝিয়ে বললে বুঝবে ও···'

'না, ব্যাপারটা আপনাকে বিশ্বাস করা বা না করার নয়!' জানালার দিকে পিছন ফিরল মাইকেল ডাফ।

'নয় বলছেন? কিন্তু আমি তো তাই বুঝলাম!'

নাকের পাশটা চুলকাল মাইকেল ডাফ। 'আপনি রানার অ্যাসিস্ট্যান্ট, একেবারে অচেনা কেউ নন···একটা রশিদ দিতে পারবেন তো, মিস সোফিয়া?'

ব্রিটিশ দূতাবাসের লেটার প্যাডে খস খস করে কয়েকটা কথা লিখল মাইকেল ডাফ, তাতে সই করল সোফিয়া ক্যারল। নামের পাশে নিজের পাসপোর্ট

নম্বরটাও বসাল। পাশের কামরায় ঢুকল মাইকেল ডাফ, একটা প্যাকেট নিয়ে ফিরে এল আবার।

'রানাকে আমার সালাম জানাবেন,' দূতাবাসের সদর দরজা পর্যন্ত সোফিয়ার সঙ্গে হেঁটে এল মাইকেল ডাফ। 'সেঙ্গি সেঙ্গি থেকে কবে ফিরছে সে?'

'আজ বিকেলে হেলিকপ্টারে চড়ে ওর কাছে যাচ্ছি আমি···।' নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখছে সোফিয়া, কথা বলছে হাসিমুখে। দরজার কাছে পৌঁছে হ্যাণ্ডশেক করল ওরা।

রাস্তার এক ধারে আর্মি ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে ক্যাপটেন সোল। সীটে বসে হেলান দিল সোফিয়া। চোখ বুজে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মাইকেল ডাফের দেয়া প্যাকেটটা দু'হাতে শক্ত করে ধরে আছে।

'মহামান্য প্রেসিডেন্ট আপনার জন্যে ইয়টে অপেক্ষা করছেন, মিস সোফিয়া,' ল্যাণ্ডরোভার ছেড়ে দিয়ে বলল ক্যাপটেন সোল। লেকসাইড রোড ধরে হারবারের দিকে ছুটল গাড়ি।

ফিশ ফ্যাক্টরী ছাড়িয়ে আরও খানিক সামনে নৌ-বাহিনীর জেটিতে নোঙর ফেলেছে ইয়টটা। ধনী এক এশিয়ান ব্যবসায়ীর শখের জিনিস ছিল ওটা, ক্ষমতায় আসার পর উবোমো থেকে তাকে বহিষ্কার করেছেন সিমন সাফারি। আগেই তার সমস্ত সম্পত্তি ও ব্যবসা বাজেয়াপ্ত করা হয়, তার মধ্যে এই ইয়টটাও ছিল।

পঁয়তাল্লিশ ফুট লম্বা একটা ক্যাসপার অ্যাণ্ড নিকলসন ওটা, আরাম ও বিলাসের সব রকম উপকরণ দিয়ে ভেতরটা সাজানো। মেইন কেবিনে এই মুহূর্তে মাত্র দু'জন ভদ্রলোক বসে আছেন। ইউডিসি-র মাসিক লাভ-লোকসানের রিপোর্ট দেখছেন সিমন সাফারি, টেবিলের ওদিক থেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, চোখে প্রত্যাশা। রিপোর্টটা রেখে দিয়ে মুখ তুললেন সিমন সাফারি। হাসলেন তিনি, সাড়া দিয়ে চণ্ডমণ্ড গণ্ডও মৃদু হাসলেন।

'আমি মুগ্ধ, মি. গণ্ড,' বললেন প্রেসিডেন্ট, মাথা নত করে সম্মান দেখালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'উবোমোয় এসে কোম্পানীর দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন মাত্র অল্প ক'দিন হলো, এরই মধ্যে দারুণ লাভ হতে শুরু করেছে।'

'আপনি অত্যন্ত সদয় ব্যক্তি, মি. প্রেসিডেন্ট, ইওর এক্সেলেন্সী। তবে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, আগামী মাসগুলোয় লাভের পরিমাণ আরও অনেক বেশি হবে।'

'হেলিকপ্টার মেইনটেন্যান্স ডিপো সম্পর্কে বলুন দেখি। এ-ব্যাপারে আমি উদ্বেগে আছি।'

'মোম্বা বাদ দিয়ে আমাদের রয়েছে এক হাজার ভারি হেলিকপ্টার। আমি যখন দায়িত্ব নিই, মেইনটেন্যান্স কস্ট ছিল প্রতি মাসে তিন মিলিয়ন ডলার। রিপোর্টেই দেখতে পাচ্ছেন, ওটা আমি শতকরা চল্লিশ পার্সেন্ট কমিয়ে এনেছি।'

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলল। তারপর হালকা পায়ের শব্দ ভেসে এল কেবিনের বাইরে থেকে। নক হলো দরজায়।

'কে?' জিজ্ঞেস করলেন সিমন সাফারি।

'ক্যাপটেন সোল, মি. প্রেসিডেন্ট।'

চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি, চণ্ডমণ্ড গণ্ডের দিকে তাকালেন সিমন সাফারি। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। লেক হাউসের বোর্ড রুমে মীটিঙে না বসে এখানে বসার পিছনে কারণ আছে। 'কাম ইন,' নির্দেশ দিলেন সিমন সাফারি। দরজা একপাশে সরে গেল, মাথা নিচু করে কেবিনে ঢুকল ক্যাপটেন সোল, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্যালুট করল।

'ডকে, ল্যাণ্ডরোভারে মিস সোফিয়াকে বসিয়ে রেখে এসেছি আমি,' রিপোর্ট করল সে।

'ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে প্যাকেটটা এনেছে সে?'

'জ্বী, স্যার। তাঁর কাছেই রয়েছে ওটা।'

আবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন সিমন সাফারি ও চণ্ডমণ্ড গণ্ড, তবে এবার দু'জনেই হাসছেন।

'ঠিক আছে, সোল,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন সিমন সাফারি। 'কি করতে হবে তুমি জানো।'

'জ্বী, জানি, মি. প্রেসিডেন্ট। মি. গণ্ড ও মিস সোফিয়ার সঙ্গে লামু দ্বীপে যেতে হবে আমাকে, তারপর আমাকে···।'

'নতুন করে বলার দরকার নেই, ক্যাপটেন সোল,' বাধা দিলেন সিমন সাফারি। 'তবে প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন হওয়া চাই। এবার তুমি মিস সোফিয়াকে এখানে আনতে পারো।'

তিন মিনিট পর ঝড়ের বেগে কেবিনে ঢুকল সোফিয়া। সরাসরি সিমন সাফারির দিকে এগোল সে, চণ্ডমণ্ড গণ্ডের দিকে তাকালই না। 'এনেছি, সিমন!' আনন্দে ও উত্তেজনায় টগবগ করে যেন ফুটছে সে। 'এই নাও!' সিমন সাফারির সামনে এনভেলাপটা রাখল সে।

এনভেলাপ খুলে ভিডিও টেপটা বের করলেন সিমন সাফারি। 'তুমি ঠিক জানো এটাই সেটা?'

'অবশ্যই সেটা। লেবেলে আমার নোট লেখা রয়েছে না!'

'ওয়েল ডান। তোমার ওপর স্যাংঘাতিক খুশি আমি।' হাসছেন সিমন সাফারি। 'এসো, আমার পাশে বসো, ডার্লিং।'

প্রায় ছুটে এসে সিমন সাফারির পাশে বসে পড়ল সোফিয়া। টেবিলের তলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার উরু স্পর্শ করলেন তিনি। 'ক্যাপটেন সোল, ফ্রিজে একটা শ্যাম্পেনের বোতল আছে। এত বড় সাফল্য অর্জনের পর একটু আনন্দ না করলে চলে না।'

বার-এর সামনে এসে বোতলটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল ক্যাপটেন সোল। কোন্ গ্লাসটা সোফিয়াকে দেয়া হবে তা আগেই ঠিক করে রেখেছে সে। সাদা পাউডার মেশাবার পরও শ্যাম্পেনের রঙ আগের মতই থাকল। খেতে একটু তেতো লাগলেও, কোন অভিযোগ করল না সোফিয়া। তার গ্লাসটা দ্বিতীয়বার ভরে দিল ক্যাপটেন সোল।

ধীরে ধীরে সিমন সাফারির গায়ে হেলান দিল সোফিয়া। তাঁর কি একটা কথায় হাসি পেল, হাসলও, তবে অনুভব করল মুখের চামড়া কেমন যেন অসাড় লাগছে।

সিমন সাফারি প্রস্তাব দিলেন, 'চলো, ইয়ট নিয়ে খানিক দূরে যাই; সূর্যাস্ত দেখা যাবে।'

'দারুণ!' বলার চেষ্টা করল সোফিয়া, শব্দটা জড়িয়ে গেল মুখের ভেতর। হঠাৎ সিধে হয়ে বসার চেষ্টা করল সে, পালা করে সিমন সাফারি আর চণ্ডমণ্ড গণ্ডের দিকে তাকাল। তার মাথার ভেতর কি রকম অদ্ভুত একটা শব্দ হচ্ছে। ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি। আবার সিমন সাফারির গায়ে হেলান দিল সে।

সিমন সাফারির ভারি গলা শুনতে পেল সোফিয়া, মনে হলো অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। 'গুড বাই, মাই ডিয়ার!'

সোফিয়া জ্ঞান হারাবার পর অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বললেন না। ইতিমধ্যে সোফিয়াকে ধরে কেবিনের মেঝেতে শুইয়ে দিয়েছে ক্যাপটেন সোল। টেবিল থেকে কাগজ-পত্র গুছিয়ে ব্রিফকেসে ভরে নিলেন সিমন সাফারি। দরজা খুলে ধরল ক্যাপটেন সোল, কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। দরজার কাছে একবার থেমে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন কেবিনের ভেতর। চণ্ডমণ্ড গণ্ড এখনও তাঁর চেয়ারে বসে আছেন, তাকিয়ে আছেন অজ্ঞান সোফিয়ার দিকে। তার চোখে অদ্ভুত এক লোভাতুর দৃষ্টি ফুটে উঠেছে।

জেটির শেষ মাথায় পৌঁছে ক্যাপটেন সোলকে সিমন সাফারি বললেন, 'এখানে আবার ফিরিয়ে আনার আগে দেখে নিয়ো ইয়টটা ভাল করে ধোয়া হয়েছে কিনা। প্রেশার হোস কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, জানো তো?'

'জী, স্যার, জানি।'

মার্সিডিজে চড়ে বিদায় নিলেন সিমন সাফারি।

ইয়টের এঞ্জিন আগে থেকেই সচল রাখা হয়েছে। নোঙর তুলে হুইলে চলে এল ক্যাপটেন সোল, জেটি থেকে রওনা হয়ে গেল ওরা। হারবার-এর প্রবেশমুখের দিকে যাচ্ছে।

লামু দ্বীপে পৌঁছুতে দু'ঘণ্টা লাগল। ইতিমধ্যে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। নোঙর ফেলার পর ক্যাপটেন সোল বলল, 'আমরা পৌঁছে গেছি, স্যার।'

'একটু সাহায্য করুন, প্লীজ, ক্যাপটেন।'

কেবিনে চলে এল ক্যাপটেন সোল। সোফিয়া এখনও শুয়ে আছে মেঝেতে। ধরাধরি করে খোলা ককপিটে আনা হলো তাকে। সোল খাড়া করে ধরে রাখল, চণ্ডমণ্ড গণ্ড স্টেনলেস স্টীল রেইলিং-এর সঙ্গে তার কব্জি ও গোড়ালি স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধলেন। সোফিয়ার নিচে নাইলনের একটা শিট বিছালেন তিনি, চাদরটার একটা প্রান্ত ইয়টের পিছন দিকে ঝুলে থাকল, এতে করে ডেকটা হোস পাইপের পানি দিয়ে ধোয়া সহজ হবে।

'আমার আর কোন সাহায্যের দরকার নেই,' ক্যাপটেন সোলকে বললেন তিনি। 'রাবার ডিঙ্গি নিয়ে দ্বীপে চলে যান আপনি। আমি না ডাকা পর্যন্ত ওখানেই থাকবেন। কানে যা-ই শুনুন, এদিকে আসার কোন দরকার নেই।

বুঝতে পারছেন তো?'

'জী, মি. গণ্ড।'

ডিঙ্গি নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল ক্যাপটেন সোল, ইয়টের পিছনে দাঁড়িয়ে তার চলে যাওয়া দেখলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। দ্বীপের গায়ে ভিড়ল তার ডিঙ্গি, আউটবোর্ড মোটর বন্ধ হলো, নিভে গেল টর্চের আলো।

সোফিয়ার দিকে ফিরলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। ঝুলে পড়েছে সে, স্ট্র্যাপগুলোয় টান পড়েছে। ককপিটের আলোয় অত্যন্ত ম্লান দেখাচ্ছে তাকে, এলোমেলো হয়ে আছে মাথার চুল।

একা হবার পর মুহূর্তগুলো দারুণ উপভোগ করছেন তিনি। শারীরিক অর্থে সোফিয়া তাঁকে আকৃষ্ট করে না, তাঁর পছন্দের চেয়ে মেয়েটার বয়েস অনেক বেশি, তাসত্ত্বেও অনুভব করলেন ধীরে ধীরে বাড়ছে উত্তেজনা। একটু পরই এত মগ্ন হয়ে পড়বেন, এতটা বদলে যাবেন যে এ-ধরনের সামান্য বিষয়ের কোন গুরুত্ব থাকবে না।

চারদিকে চোখ বুলালেন তিনি, কোন তাড়াহুড়ো নেই। পরিবেশটা দেখে নিচ্ছেন। লামু দ্বীপ মেইনল্যাণ্ড থেকে বারো মাইল দূরে, লেকের পানিতে গিজগিজ করছে হিংস্র কুমীর। পানিতে কিছু একটা ফেলা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়বে ওগুলো, যাই ফেলা হোক কয়েক মিনিটের মধ্যে তার আর কোন কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। তাছাড়া, খোদ এ-দেশের প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি তাঁর নিরাপত্তার দিকটা দেখছেন।

সোফিয়ার কাছে ফিরে এলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। মেয়েটার বাহুতে একটা ট্রয়্যারনিকেই লাগানো হয়েছে, সেটা অ্যাডজাস্ট করলেন তিনি। যন্ত্রটার কাজ হলো রক্তবাহী শিরাকে ফোলানো। সোফিয়ার কনুইয়ের নিচের দিকটা ম্যাসেজ করতে শুরু করলেন, যতক্ষণ না শিরাগুলো মোটা ও নীল হয়ে উঠল। তাঁর সঙ্গে অ্যান্টিডোট ও ডিজপোজেবল সিরিঞ্জ সব সময়ই থাকে, কারণ ওষুধটা ব্যবহার করার সুযোগ প্রায়ই আসে।

ইঞ্জেকশনটা দেয়ার মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরই চোখ মেলল সোফিয়া ক্যারল। চোখ মিট মিট করে তাঁর দিকে তাকাল সে। 'গুড ইভিনিং, মিস ক্যারল,' উত্তেজনায় খসখসে শোনাল চণ্ডমণ্ড গণ্ডের গলা। 'আমি আর আপনি সামান্য একটু ফুর্তি করব এখন।'

ছয়

লুকানো ল্যাণ্ডরোভার থেকে ভিটিআর ইকুইপমেন্টগুলো নিয়ে এল রানা, যাবার বা আসার পথে কোন বিপদ ঘটল না। ড. ফাহিম ফয়সল হেডকোয়ার্টারে একটা জেনারেটর বসিয়েছেন, ভিডিওর ব্যাটারি রিচার্জ করতে কোন অসুবিধে হলো না। ঠিক হলো, পরদিন ছবি তোলার জন্যে রওনা হবে ওরা।

ড. ফাহিম ফয়সল জেদ ধরলেন, তিনিও ওদের সঙ্গে যাবেন।

কিন্তু মনিকা বলল, 'এ-ধরনের ঝুঁকি আপনি নিতে পারেন না, ড. ফয়সল। আপনার কিছু হলে গোটা আন্দোলনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

রানাও তার সঙ্গে একমত হলো। ড. ফাহিম ফয়সলের বয়স সত্তরের ওপর। অত্যন্ত দুর্গম এলাকা পেরোতে হবে ওদেরকে। ওয়েঙ্গু এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। কিন্তু এ-সব যুক্তি শুনলেন না ড. ফয়সল, বললেন, 'উবোমো আমার দেশ। আমি সেকেণ্ড হ্যাণ্ড রিপোর্টে সন্তুষ্ট হতে পারি না। আমার লোক আর আমার মাটির ওপর সিমন সাফারি কি অত্যাচার করছে তা আমাকে নিজের চোখে দেখতে হবে।'

এরপর আর কোন তর্ক চলে না। পরদিন সকালে যখন রওনা হলো ওরা, ওদের সঙ্গে ড. ফয়সল থাকলেন। লোদজি হাবিব আটজন লোককে পোর্টার হিসেবে চাকরি দিয়েছে, তাদের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে পারুমা। সে জানে, বামবুটিরা কোন কাজেই বেশিক্ষণ আগ্রহ ধরে রাখতে পারে না, পোর্টাররা মাথার বোঝা ফেলে পিছন দিকে দৌড় দিলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই—তাকে লক্ষ রাখতে হবে সে-ধরনের কিছু যাতে না ঘটে। আশার কথা হলো, সবাই ওরা পারুমার জিভকে সাংঘাতিক ভয় পায়।

তিন দিনের দিন প্রথম লাল নদীটার সামনে পৌঁছুল ওরা। মাথার বোঝা নামিয়ে পোর্টাররা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পাড়ে। কারও মুখে হাসি বা কথা নেই। এমনকি পারুমাও বিষণ্ন হয়ে পড়েছে।

লাল কাদা, পশু-পাখির লাশ, বিষাক্ত আগাছা পেরিয়ে নদীর কিনারায় নামল রানা, ঝুঁকে এক মুঠো কাদা তুলে নিল। নাকের সামনে তুলে গন্ধ শুঁকল, তারপর ফেলে দিল ছুঁড়ে, চেষ্টা করল হাতের দাগ মোছার। 'জিনিসটা কি বলো তো, মনিকা?' উঁচু পাড়ের দিকে ফিরে জানতে চাইল ও। 'এর কারণ কি?'

'এটা হলো সেই রিএজেন্ট, সিমন সাফারি যেটা ব্যবহার করছেন না বলে তোমাকে জানিয়েছেন।' মনিকার পরনে শুধু একটা টি-শার্ট আর শর্টস, মাথায় পরেছে রঙিন হেডব্যাণ্ড। রাগে তার শরীরটা যেন কাঁপছে।

'এই রিএজেন্টে কি আছে?'

'আর্সেনিক!'

রানার চোখে অবিশ্বাস। 'কি বলছ! এ তো স্রেফ পাগলামি!'

'শয়তানি সঠিক শব্দ। এই লোকগুলো সুস্থ নয়, রানা। এদের কোন দায়িত্ববোধ নেই। টাকার লোভে গোটা বনভূমি বিষাক্ত করে ফেলেছে এরা।'

উঁচু পাড়ে উঠে এল রানা, মনিকার সামনে দাঁড়াল। 'বাস্টার্ডস,' বিড়বিড় করে বলল ও। ওর চেহারা লালচে হয়ে উঠেছে দেখে কাছে সরে এল মনিকা, ওর একটা হাত ধরল।

'এখনও তুমি সবটা দেখোনি, রানা,' বলল সে। 'এখান থেকে মাত্র শুরু হলো। ওয়েঙ্গুতে পৌঁছে মাথা খারাপ হয়ে যাবে তোমার। চলো, নিজের চোখেই দেখবে।'

আবার রওনা হলো ওরা। কোথাও না থেমে পাঁচ ঘণ্টা ধরে হাঁটছে, এমন সময় হঠাৎ বামবুটি পোর্টাররা দাঁড়িয়ে পড়ল, যে যার মাথা থেকে ফেলে দিল বোঝাগুলো।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইলেন ড. ফয়সল।

ব্যাখ্যা দিল মনিকা। 'বামবুটিদের নির্দিষ্ট একটা সীমানা আছে, যার বাইরে তারা শিকার করতে পারে না। আমরা সেই সীমানার কাছে চলে এসেছি। সীমানার ওপারটা পবিত্র মধ্যভূমি, ওখানে শিকার করলে বামবুটিরা মনে করে মহা পাপ হবে। কাজেই ওরা সামনে এগোতে ভয় পাচ্ছে।'

'ওদেরকে রাজি করানোর উপায় কি?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল মনিকা। 'আমরা কিছু বলতে গেলে হিতে বিপরীত হবার বেশি সম্ভাবনা। ব্যাপারটা পারুমার ওপর ছেড়ে দাও।'

পারুমা বুড়ি তার অভিনয় প্রতিভার সবটুকু কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। কখনও তেড়ে মারতে যাচ্ছে, আবার কখনো আদর করে হাত বুলাচ্ছে মুখে বা মাথায়, কথা বলছে কানে কানে। এক ফাঁকে একটা গানও গাইল। তারপর মন্ত্র আওড়ে ফুঁ দিল সবার গায়ে। কয়েক পাক নাচল। সবশেষে গাছের ছাল উঁচু করে দেখিয়ে দিল নিজের পিছনদিকটা। আশ্চর্যই বলতে হবে, এত বয়েসেও যেমন মসৃণ তেমনি সুগঠিত তার নিতম্ব।

এভাবে প্রায় এক ঘণ্টা চলার পর হঠাৎ একজন পোর্টার তার বোঝাটা মাটি থেকে মাথায় তুলল। দেখাদেখি বাকি সবাইও। শান্তভাবে পবিত্র মধ্যভূমিতে প্রবেশ করল ওরা।

পরদিন ভোরে মেশিনের আওয়াজ পেল ওরা। যতই এগোল, ততই বাড়ল আওয়াজটা। ইতিমধ্যে অনেকগুলো নদী পেরুতে হয়েছে ওদেরকে, সবগুলোর কাদা মধুর মত লালচে। মেশিনের আওয়াজ ছাড়া বনভূমিতে আর কোন শব্দ নেই। কোন হরিণ বা পাখি, বানর বা খরগোস কিছুই চোখে পড়ল না। পোর্টাররা সবাই খুব ভয় পেয়েছে, পরস্পরের কাছাকাছি থাকছে তারা, ঘন ঘন চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে।

দুপুরের দিকে থামল লোদজি হাবিব, মনিকার কানে কানে কথা বলল। হাত তুলে পুবদিকটা দেখাল সে। রানা ও ড. ফয়সলকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল মনিকা। 'লোদজি হাবিব বলছে, আমরা কাছাকাছি চলে এসেছি। বনভূমিতে শব্দ খুব রহস্যময়—মেশিনগুলো কাজ করছে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। আর সামনে বাড়া উচিত হবে না, কারণ বনভূমির কিনারায় ওদের পাহারা আছে।'

'এখন তাহলে করণীয় কি আমাদের?' জানতে চাইলেন ড. ফয়সল।

'লোদজি হাবিব বলছে, পুবদিকে কয়েকটা পাহাড় আছে। পাহাড়ের মাথা থেকে মাইনিং ও লগিং এরিয়া দেখতে পাব আমরা। পোর্টারদের নিয়ে এখানে থাকবে পারুমা। আমরা শুধু চারজন যাব।'

প্যাকেট খুলে ভিটিআর বের করল রানা।

এক লাইনে পাহাড়ে চড়ল ওরা, পথ দেখাল লোদজি হাবিব। চূড়ায় ওঠার

পরও দেখা গেল, বনভূমি ওদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে। ওদের নিচ থেকে ভেসে আসছে ডিজেল এঞ্জিনের শব্দ। 'এবার?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এখান থেকে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।'

পথ দেখিয়ে ওদেরকে আরও খানিক সামনে নিয়ে এল লোদজি হাবিব। আশপাশের গাছ প্রতোকটি প্রকাণ্ড, ওগুলোর মধ্যে সবচেয়ে যেটা মোটা ও লম্বা সেটার গোড়ায় থামল ওরা। 'পরস্পরের হাত ধরে থাকা বিশজন পিগমিও গাছটাকে বেড় দিতে পারবে না,' ফিসফিস করল মনিকা। 'কল্পনা নয়, চেষ্টা করে দেখা হয়েছে। এটা বামবুটি গোত্রের পবিত্র গাছ।' গাছের গায়ে খাঁজ কাটা হয়েছে, সিঁড়ির ধাপের মত, হাত তুলে দেখাল সে।

ধাপ বেয়ে প্রথমে উঠল লোদজি হাবিব। কয়েকটা ধাপ ঢালু হয়ে গেছে, কোনটায় পচন ধরেছে। নতুন করে ধাপ বানাতে হলো তাকে। গাছের গায়ে খাঁজ তো আছেই, গাছটাকে ঘিরে লতাপাতা দিয়ে তৈরি একটা মইও উঠে গেছে ওপর দিকে। লোদজি হাবিবকে অনুসরণ করে একশো ফুট ওপরে উঠে এল বাকি তিনজন। ড. ফয়সলকে মাঝখানে রাখল রানা ও মনিকা, মাঝে মাঝে থেমে উঠতে সাহায্য করল তাঁকে।

আরও ওপরে উঠল লোদজি হাবিব, গাছের কাণ্ড এদিকটায় গোড়ার তুলনায় অর্ধেক মোটা। যত ওপরে উঠল ওরা, ততই বদলে গেল আলো। তারপর হঠাৎ ওরা বেরিয়ে এল রোদের মধ্যে।

পবিত্র হানি ট্রি-র মগডালে উঠে এসেছে দলটা। নিচের দিকে তাকিয়ে বনভূমির ছাদ দেখতে পেল ওরা। বিশাল সমুদ্রের মত বিস্তৃত হয়ে আছে চারদিকে—সবুজ ও নিশ্ছিদ্র, শুধু উত্তর দিকটা বাদে। ওদিকে তাকিয়ে দম বন্ধ হয়ে এল ওদের, চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল সবাই।

উত্তর দিকে বনভূমি বলতে কিছুই নেই। ওদের নিচে পাহাড়, পাহাড়ের গোড়া থেকে যতদূর দৃষ্টি গেল, সেই বরফ ঢাকা প্রান্তর পর্যন্ত, সব ফাঁকা ও খালি, একটা গাছও দেখা যাচ্ছে না। যেখানে বনভূমি ছিল সেখানে এখন শুধু রয়েছে লাল মাটি।

অনেকক্ষণ কেউ কথা বলতে পারল না। নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ড. ফয়সল। 'মাই গড! এ তো অক্ষমনীয় অপরাধ! এত নির্মম সে হলো কিভাবে! এই ক্ষতি পরিমাপ করবে কে?'

'ক্ষতির হিসাব করা সম্ভব নয়,' বিড়বিড় করল মনিকা। 'পাঁচ লাখ একর, এক মিলিয়ন একর···আমি জানি না। মনে রাখতে হবে, এখানে প্রায় এক বছর ধরে এই কাজ করছে ওরা। আজ থেকে আরও এক বছর পর জঙ্গলের চেহারা কি দাঁড়াবে, কল্পনা করুন। ওই দানবগুলো যদি···,' হাত তুলে মোমু ভেহিকেলের সারিটাকে দেখাল সে। বনভূমির কিনারায় একযোগে কাজ করছে ওগুলো।

'এখানে দশটা মোমু মেশিন কাজ করছে!' ফিসফিস করে বলল রানা।

মাথা নাড়লেন ড. ফয়সল। 'মাত্র দশটা মেশিন জঙ্গলের এত বড় একটা এলাকা এভাবে সাফ করতে পারে না!'

মোমুগুলোর সামনে এক সারি ক্যাটারপিলার ট্র্যাক্টর সচল রয়েছে, মোমুকে এগোবার সুযোগ করে দিচ্ছে গাছগুলোকে ফেলে দিয়ে। কাঁপতে কাঁপতে আকাশ ছোঁয়া গাছগুলো ধরাশায়ী হচ্ছে একের পর এক।

অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলো রানা। ওর পাশে একটা ডালে বসে ফোঁপাতে শুরু করেছে লোদজি হাবিব। কাঁধ থেকে ভিটিআর নামাল রানা, চোখের সামনে তুলে তৈরি হলো ছবি তোলার জন্যে।

সন্ধে পর্যন্ত পবিত্র হানি ট্রি-র মগডালে থাকল ওরা। বনভূমি উজাড় করার প্রতিটি কর্মকাণ্ড ক্যামেরায় বন্দী করল রানা। তারপর বৃষ্টি নামল, থামার কোন লক্ষণ নেই বুঝতে পেরে পিচ্ছিল মই বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। কোন বিপদ হলো না, গাছ থেকে নেমে পারুমা আর পোর্টারদের কাছে ফিরে এল দলটা। সকালে রওনা হলো গোনডালার উদ্দেশে। ফেরার পথে লাল নদীগুলোর ছবি তুলল রানা।

পবিত্র মধ্যভূমিতে এসে একটা হাতির পায়ের ছাপ দেখতে পেল লোদজি হাবিব। হাতিটাকে চিনতেও পারল সে, নাম বলল—এক কানওয়ালা বুড়া। পোর্টাররাও তার সঙ্গে একমত হলো। হাতিটার নাকি একটা কান নেই। ক'দিন পর এই প্রথম হাসল ওরা, যেন বনভূমির মাঝখানে পুরানো এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে তাদের। কিন্তু তাদের মুখের হাসি একটু পরই মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ আতঙ্কে কাঁপতে শুরু করল পোর্টাররা। কেউ কেউ কেঁদে ফেলল। লোদজি হাবিবের সামনে ছুটে এল মনিকা, জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, বুড়ো বাপ?'

'রক্ত,' জবাব দিল লোদজি হাবিব। 'হাতিটার রক্ত আর পেচ্ছাব। এক কানওয়ালা বুড়া আহত হয়েছে। মারা যাচ্ছে সে।'

'কেন, কি কারণ?' চিৎকার করছে মনিকা। সে-ও এই হাতিটাকে চেনে, ভালবাসে পুরানো বন্ধুর মত।

'কোন মানুষ তাকে আঘাত করেছে। পবিত্র মধ্যভূমিতে কেউ তাকে শিকার করছে। এ-ধরনের কাজ ভয়ানক অপরাধ, গোত্রের তরফ থেকে কড়া নিষেধ আছে। এই দেখ, হাতির পায়ের ছাপগুলো দেখ, ওগুলোর ওপর মানুষের পায়ের ছাপ পড়েছে—দেখছিস?'

হঠাৎ নিজের কপালে চটাস চটাস চাপড় মেরে কাঁদতে শুরু করল পারুমা। কান্নার ফাঁকে বলল, 'এই পায়ের ছাপ আমি চিনি। এই মানুষকে আমি চিনি! এটা সেই শু-খেকো হারাম-খোর ওজি হাবিবের পায়ের ছাপ!'

দুই হাতে মুখ ঢেকে বামবুটিরা অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল। একটা হাতির জন্যে মানুষ এভাবে শোকে কাতর হয়ে পড়তে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করত না রানা। ওদের কান্না দেখে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল ওর। পারুমা কাঁদছে আর কথা বলছে। তার কথা থেকে জানা গেল, বনভূমির দেবতা ওদের সবার ওপর প্রতিশোধ নেবেন।

আজ তিন দিন ধরে হাতিটাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে ওজি হাবিব। গভীর

জঙ্গলে, ঘন ঝোপের ভেতর ঘুমাচ্ছে হাতি, এই প্রথম ওটাকে দেখতে পেল সে। প্রায় দশ মিনিট এক চুল নড়ল না, তারপর সাবধানে ও নিঃশব্দে এগোল। তবু তার উপস্থিতি টের পেয়ে গেল বুড়া, ঘুম থেকে জেগে উঠল বিশাল দৈত্য। তবে কোন শব্দই তার কানে ঢোকেনি, কারণ ওজি হাবিব অত্যন্ত সতর্ক ও দক্ষ শিকারী।

শুড় লম্বা করল বুড়া, বাতাস টানল, সেই বাতাস ধীরে ধীরে গ্রহণ করল মুখের ভেতর। তার ওপরের ঠোঁটে ওলফ্যাকটরি গ্ল্যাণ্ড গোলাপ কুঁড়ির মত খুলে গেল, বাতাসের স্বাদ নিল সে। বাতাসের উল্টোদিকে রয়েছে ওজি হাবিব, রয়েছে মাটি ঘেঁষে, কাজেই তার কোন গন্ধ বুড়া পেল না।

তারপর হাতি একটা শব্দ করল। কোমল, গুড়গুড় শব্দ, শব্দটা হচ্ছে তার পেটে, তার সঙ্গে যোগ হলো কাঁপা কাঁপা একটা আওয়াজ, করুণ সুরে বাঁশি বাজার মত, বেরিয়ে আসছে গলা থেকে। এটা হলো হাতির গান। আশপাশে আরেকটা হাতি আছে, নাকি পরম শত্রু কোন মানুষ আছে বোঝার জন্যে গান গাইছে বুড়া।

ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসে রয়েছে ওজি হাবিব, শুনতে পেল গান গাইছে হাতি। মুঠো করা একটা হাত তুলল সে মুখের সামনে, তারপর নকল করল হাতির সুর।

ওজি হাবিব হাতির গান গাইছে।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল হাতি, তারপর গানের সুরটা বদলাল, অদৃশ্য উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছে। কান পেতে নতুন সুরটা শুনল ওজি হাবিব, নকল করল সেটাও। এবার নিশ্চিন্ত হলো বুড়া, বিশ্বাস করল আশপাশে আরেকটা হাতি আছে। কানটা ঝাপটাল সে, বোঝাতে চাইল সে খুশি হয়েছে। তারপর ঝোপ ভেঙে এগোল সামনে।

ইস্পাতের একটা লম্বা রড জোগাড় করেছে ওজি হাবিব, সেটাকে গরম করে পিটিয়েছে, ডগাটা পাথরে ঘষে ধারাল করে নিয়েছে বর্শার মত। ঝোপের ভেতর শুয়ে রডটা বাগিয়ে ধরে আছে সে, দেখতে পেল তার মাথার ওপর ঝুলে রয়েছে ঢাকানো একজোড়া আইভরি। রডটা লম্বায় ওজি হাবিবের দ্বিগুণ, খুব ভারিও বটে। এটা দিয়ে সে হাতির ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ড ভেদ করতে পারবে না। আর মাথার তো নাগালই পাবে না। লাফ দিয়ে সিধে হলো সে, ছুটে ঢুকে পড়ল বুড়ার পেটের নিচে। দাঁড়াল হাতির পিছন দিকের দু'পায়ের মাঝখানে, ওপর দিকে। অর্থাৎ হাতির উরুসন্ধিতে সবেগে গাঁথল রডটা। ঝুলে থাকা চামড়া ভেদ করে গেল ধারাল বর্শা, চিরে দিল ব্লাডার। গরম ও হলুদ প্রস্রাব ঝর্ণার মত সবেগে বেরিয়ে এল। ব্যথায় মোচড় খেল বুড়ার শরীর, বাঁকা হয়ে গেল পিঠ। তারপর তুফান তুলে ছুটল সে।

রক্তাক্ত বর্শায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওজি হাবিব। এক সময় হাতির চিৎকার মিলিয়ে গেল দূরে। রক্ত আর প্রস্রাব অনুসরণ করল সে, হাঁটছে ধীর পায়ে। সে জানে, আঘাতটা মোক্ষম জায়গায় লেগেছে, এতেই মৃত্যু হবে বুড়ার। এত বড় একটা শিকার করেও তার মনে কিন্তু আনন্দ নেই। বরং একটা

অপরাধবোধ জাগছে। বন দেবতাকে অসন্তুষ্ট করেছে বলে ভয়ও লাগছে তার।

পরদিন সকালে বুড়ার লাশ দেখতে পেল ওজি হাবিব। হাঁটু গেড়ে বসে আছে, দাঁত দুটো নরম মাটিতে গাঁথা। দেখে মনে হলো বিশ্রাম নিচ্ছে, কিন্তু খোলা চোখ দুটোয় কোন প্রাণ নেই, এতটুকু নড়ছে না। হাতের বর্শা ফেলে দিয়ে বনদেবতার উদ্দেশে প্রার্থনাসূচক গান গাইতে শুরু করল ওজি হাবিব, তবে থেমে গেল মাঝপথে। তার মনে হলো, যে অপরাধ সে করেছে, এরপর আর দেবতার উদ্দেশ্যে গান গাওয়ার কোন অধিকার তার নেই।

ছোট একটা আগুন জ্বেলে হাতির মাংস সেদ্ধ করে খেল সে। তারপর ম্যাচেটির সাহায্যে আইভরিগুলো কাটতে শুরু করল। তখনও কাটা শেষ হয়নি, তার গোত্রের লোকেরা তাকে দেখতে পেল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে এসেছে তারা, সবার আগে রয়েছে লোদজি হাবিব ও পারুমা। ওজি হাবিবকে ঘিরে দাঁড়াল তারা। মুখ তুলে তাদেরকে দেখতে পেল সে। হাত থেকে পড়ে গেল ম্যাচেটি। ধীরে ধীরে দাঁড়াল সে, তাদের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। 'আমি তোমাকে পুরস্কারের অর্ধেক ভাগ দেব, বড় ভাই,' বলল সে, কিন্তু কেউ তার কথায় সাড়া দিল না।

এক এক করে তার দিকে পিছন ফিরল বামবুটিরা, অদৃশ্য হয়ে গেল গভীর বনভূমিতে। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে ফিরে গেছে তারা, একা শুধু লোদজি হাবিব রয়ে গেছে। 'তোমার এই অপরাধের কারণে বনদেবতা আমাদের সবাইকে শায়েস্তা করবেন। মোলিমোকে পাঠাবেন তিনি।'

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল ওজি হাবিব, চোখ তুলে তাকাতে পারল না।

সিমন সাফারির অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন প্রতিদিন নতুন শক্তি অর্জন করছে। শহর থেকে রোজই স্থানীয় নেতারা ড. ফয়সলের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে আসছেন। আন্দোলন করছে বেশিরভাগ উহালিরাই, তবে কিছু কিছু হিটাও আসতে শুরু করেছে। সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হবে, কাজেই ড. ফয়সলের খুব ব্যস্ত সময় কাটছে। তাঁর ভাইপো, শেখ ফারুক ফয়সল, রানাকে প্রস্তাব দিল হিটাদের লেবার ক্যাম্পে যে নির্মম নির্যাতন চলছে তার ছবি তোলার। প্রস্তাবটা শুনেই লুফে নিল রানা। সেদিন বিকেলেই রওনা হয়ে গেল ওরা, সঙ্গে থাকল লোদজি হাবিব ও কয়েকজন পোর্টার। ছবি তুলে চারদিন পর ফিরে এল ওরা।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর ভিডিও টেপটা ওদেরকে দেখাল রানা। একটা দৃশ্যে দেখা গেল, হাত বাঁধা উহালি শ্রমিকদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হিটা সৈনিকরা। অনেক দূর থেকে তোলা ছবি, তবু শ্রমিকদের হাড় বেরিয়ে থাকা চেহারা পরিষ্কার দেখা গেল। তারপর সাক্ষাৎকারের দৃশ্য। প্রিজন ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আসা শ্রমিকরা লেন্সের দিকে তাকিয়ে বলল, তাদেরকে চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র একবার খেতে দেয়া হয়েছে, 'অসুস্থ হয়ে পড়লে অনেককেই মেরে ফেলা হয়েছে গুলি করে, শ্রমের বিনিময়ে কোন মজুরি দেয়া হয়নি। এক তরুণী জানাল, প্রতি

রাতে হিটা সৈনিকরা ধর্ষণ করেছে তাকে।

শেষ দৃশ্যটা দেখাবার আগে সাবধান করে দিল রানা, 'মনিকা, তোমার বোধহয় না দেখাই উচিত।'

'না, দেখব,' জেদ ধরল মনিকা।

শেষ দৃশ্যে দেখা গেল একদল উহালিকে খাদের কিনারায় দাঁড় করানো হয়েছে। দেখেই বোঝা গেল তারা সবাই অসুস্থ। হিটা সৈনিকরা তাদের সঙ্গে কৌতুক করছে, ফলে এরপর কি ঘটবে আন্দাজ করা সম্ভব হলো না। গুলিবর্ষণ শুরু হলো একেবারে হঠাৎ। হ্যাচকা টান দিয়ে কাঁধ থেকে অটোমেটিক রাইফেল নামাল হিটারা, ব্রাশ ফায়ার শুরু করল। উহালিরা পড়ে গেল খাদের ভেতর। তৈরি হয়েই ছিল কয়েকটা বুল ডোজার, এগিয়ে এসে খাদটা মাটি দিয়ে ভরে ফেলল ড্রাইভাররা।

ভিটিআর-এর সুইচ অফ করল রানা, খালি হয়ে গেল স্ক্রীন। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল মনিকা, বেরিয়ে গেল বারান্দায়। ঘরে থাকল শুধু রানা ও ড. ফয়সল। কিছুক্ষণ পর কাঁধে তাঁর হাতের স্পর্শ অনুভব করল ও। ড. ফয়সল শান্ত গলায় বললেন, 'আমাদেরকে সাহায্য করুন, মি. রানা। আমার লোকদের সাহায্য করুন। প্লীজ।'

সাত

বনভূমিতে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা, মোলিমো আসছে। বামবুটিদের সবগুলো গোত্র থেকে লোকজন আসতে শুরু করল গোনডালায়। জলপ্রপাতের নিচে সভা করার জন্যে একটা জায়গা আছে, দূর-দূরান্ত থেকে এসে সেখানেই জড়ো হচ্ছে সবাই।

কেউ কেউ এসেছে দুশো মাইল দূর থেকে, জায়গার সীমান্ত পেরিয়ে। বামবুটিরা নিজেদের ছাড়া অন্য কারও দ্বারা চিহ্নিত সীমানা মানে না। বনভূমির নিকট ও দূরতম প্রান্ত থেকে এল তারা, এল একা, এল দলবেঁধে। মোলিমোর আগমন উপলক্ষে প্রায় এক হাজার খুদে মানুষ মিলিত হলো।

মহিলারা তাদের পাতার তৈরি ঘর বানাল, যে ঘরের দরজা থাকল কোন প্রিয় মানুষ বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের দরজার দিকে মুখ করে। গোটা এলাকায় হেসে-খেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই—মোলিমোর আগমন একটা হুমকি হলেও, তাদের প্রাণচঞ্চল স্বভাবে কোন পরিবর্তন আসেনি।

সবশেষে যারা এল, তাদের মধ্যে রয়েছে ওজি হাবিব। পিছু পিছু এল তার তিন বউ, তামাক ভরা বস্তার ভারে কুঁজো হয়ে আছে তিনজনই। স্ত্রীদের নির্দেশ দিল ওজি হাবিব, ঘর বানাতে হবে তার ভাইয়ের দরজার দিকে মুখ করে। কিন্তু ঘরটা তৈরি হবার পর দেখা গেল পারুমা তার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, আরেক দিকের দেয়াল খুলে বানিয়ে নিয়েছে নতুন দরজা।

পুরানো বন্ধুদের ডাকল ওজি হাবিব, 'দেখো, কত তামাক আমার কাছে। এসো, তোমরাও নাও। যত খুশি নাও। সবাই তোমাদের পোঁটলা ভরো। এই দেখো, বোতলে কত মদ। এসো, আমার সঙ্গে বসে খাও।' কিন্তু বামবুটিদের একজন লোকও তার ডাকে সাড়া দিল না।

সন্ধের দিকে বিখ্যাত শিকারীরা গোল হয়ে বসেছে, মাঝখানে রয়েছে লোদজি হাবিব। একপাশে আগুন জ্বলছে। অন্ধকার থেকে ধীর পায়ে এগিয়ে এল ওজি হাবিব। কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে নিজের বসার জায়গা করল সে। জিন-এর খোলা বোতল থেকে পান করল, বোতলটা বাড়িয়ে ধরে পাশের লোককে, বলল, 'তুমি খাও, তারপর তোমার পাশের লোককে দাও।'

কথা না বলে উঠে গেল লোকটা। এক এক করে বাকি সবাইও উঠল, ওজি হাবিবের দিকে একবারও না তাকিয়ে চলে গেল তারা। থাকল শুধু লোদজি হাবিব। 'কাল মোলিমো আসছে,' ছোট ভাইকে নরম সুরে সাবধান করল সে। তারপর সে-ও উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল।

আগুনের ধারে একা বসে থাকল ওজি হাবিব।

পরদিন সকালে রানাকে ডাকার জন্যে ল্যাবরেটরিতে এল লোদজি হাবিব। তার পিছু নিয়ে বনভূমিতে ঢুকল রানা, কাঁধে ক্যামেরা।

শুরুতে মাত্র দু'জন হাঁটল ওরা, তারপর দেখা গেল একজন-দু'জন করে মিলিত হচ্ছে ওদের সঙ্গে। কখনও পিছন থেকে এল তারা, কখনও দু'পাশ থেকে, আবার সামনেও অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সবাই এগোচ্ছে, কেউ কোন শব্দ করছে না। এই প্রথম বামবুটিদের গম্ভীর হতে দেখল রানা। গভীর বনভূমিতে পৌঁছুল ওরা, থামল একটা সিল্ক-কটন ট্রি-র গোড়ায়। গাছটাকে ঘিরে বামবুটিরা গুটি মেরে বসে পড়ল সবাই। রানাও বসল, ছবি তুলল শান্ত সমাহিত মুখগুলোর। সবাই তারা মুখ তুলে সিল্ক-কটন ট্রি-র ওপর দিকে তাকিয়ে আছে।

'এটা হলো মোলিমোর বাড়ি,' নিচু গলায় বলল লোদজি হাবিব। 'তাকে আমরা নিতে এসেছি।'

লোকজনের ভিড় থেকে কেউ একজন চিৎকার করে কারও নাম বলল। 'আরারি!' ভিড় থেকে উঠে দাঁড়াল এক লোক, এগিয়ে গিয়ে গাছের পাশে দাঁড়াল সে।

ভিড়ের আরেক দিক থেকে আবার চিৎকার শোনা গেল, 'লোদজি হাবিব!' এবার লোদজি হাবিব প্রথম বাছাইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

খানিক পর দেখা গেল গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে পনেরো জন লোক। তাদের কেউ বুড়ো, কেউ যথেষ্ট নামকরা, আবার কেউ সাধারণ একজন পিগমি। মোলিমো উৎসবে অংশগ্রহণের অধিকার সবার সমান।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার বেরিয়ে এল লোদজি হাবিবের গলা চিরে। বাছাই করা পনেরোজন লোক তরতর করে গাছ বেয়ে উঠল। পাতা ও শাখা-প্রশাখার আড়ালে হারিয়ে গেল তারা, শুধু তাদের চেঁচামেচি আর গানের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে

নিচে থেকে। তারপর তারা নেমে এল, বয়ে নিয়ে এল একটা বাঁশ।

বাঁশটা গাছের গোড়ায় নামিয়ে রাখল তারা। এগিয়ে এসে ওটা পরীক্ষা করল রানা। বাঁশটা পনেরো ফুটের বেশি লম্বা হবে না। পরিচ্ছন্ন, শুকনো বাঁশ, সন্দেহ নেই বহু বছর আগে কাটা হয়েছে। ওটার গায়ে জটিল সব আঁচড় কাটা হয়েছে, আঁকা হয়েছে পশু-পাখির ছবি। তবে সাধারণ একটা বাঁশ ছাড়া আর কিছু নয় ওটা।

'এটাই কি তোমাদের মোলিমো?' বাঁশটাকে ঘিরে হৈ-চৈ করছে বামবুটিরা, লোদজি হাবিবের কানে ফিসফিস করল রানা।

'হ্যাঁ, বাপজান, এটাই আমাদের মোলিমো।'

'মোলিমো আসলে কি?' জানতে চাইল রানা।

'মোলিমো বনভূমির কণ্ঠস্বর,' ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে লোদজি হাবিব। 'মোলিমো হলো জনক ও জননীর আওয়াজ। তবে কথা বলাবার আগে মোলিমোকে পানি খাওয়াতে হবে।'

বাছাই করা লোকগুলো মাটি থেকে তুলে নিল মোলিমোকে, বয়ে নিয়ে এল ঝর্ণার ধারে। জলাশয়ের ঠাণ্ডা ও গাঢ় পানিতে ডোবানো হলো সেটা। কয়েক ঘণ্টা আগেই জলাশয়ের উঁচু পাড়ে জড়ো হয়েছে নারী ও শিশুরা–সবাই তারা চুপচাপ, নগ্ন ও মনোযোগী। আরও এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকল সবাই, মোলিমো পানি খাচ্ছে। তারপর আরও এক ঘণ্টা পেরোল। অবশেষে পানি থেকে তোলা হলো মোলিমোকে।

বাঁশটা চকচক করছে, পানি ঝরছে গা থেকে। ওটার খোলা প্রান্তে ঠোঁট ছোঁয়াল লোদজি হাবিব। শ্বাস টানার ফলে ফুলে উঠল তার বুক। তারপরই টিউবটা থেকে কথা বলে উঠল মোলিমো। অদ্ভুত মিষ্টি গলায় যেন কোন তরুণী বনভূমির মাঝখানে গান গাইছে। বামবুটিদের সবাই দুলে উঠল। ভিড়টা এমনভাবে দোল খেতে শুরু করল যেন কোন গাছের পাতায় হঠাৎ বাতাস লেগেছে।

তারপর মোলিমো তার সুর বদল করল। জালে ধরা পড়া আতঙ্কিত হরিণের তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। এরপর শোনা গেল ভয় পেয়ে উড়ে যাওয়া পাখির গলা। বনভূমির সমস্ত শব্দ মোলিমোর গলা থেকে বেরিয়ে আসছে। লোদজি হাবিবের জায়গায় আরেকজন লোক ফুঁ দিল বাঁশের খোলা প্রান্তে, তারপর আরেকজন।

তারপর হঠাৎ মোলিমোর গলা চিরে খেপা হাতির আওয়াজ বেরিয়ে এল। শব্দটা শুনে বামবুটিদের ভিড়টা সামনে এগোল। মোলিমোকে ঘিরে ফেলল তারা, সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে গেল। সাধারণ বাঁশের টুকরোটা ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তারপরও সেটা থেকে বেরিয়ে আসছে গর্জন ও হুংকার, তীক্ষ্ণ চিৎকার ও করুণ আর্তনাদ।

এরপর অদ্ভুত একটা দৃশ্য চাক্ষুষ করল রানা। ভিড়টার আকৃতি হঠাৎ করেই যেন বদলে গেল। কেউ আর বিচ্ছিন্ন বা আলাদা থাকল না, কারণ পরস্পরের গায়ের সঙ্গে একেবারে সেঁটে আছে তারা। সবাই যেন একটা প্রাণীতে পরিণত

হয়েছে। তারাই এখন মোলিমো। বনভূমির দেবতা এখন তাদের ওপরই ভর করেছেন।

খেপে উঠেছে মোলিমো। বনভূমির ভেতর ঝড় তুলে ছুটছে সে। কয়েকশো পা মাটির সঙ্গে গুইয়ে দিচ্ছে ঝোপ-ঝাড়, সবাই একই সঙ্গে দিক বদলে এমনভাবে ছুটছে যেন ওটা একটাই প্রাণী। নদী পেরুল মোলিমো, সাদা ফেনা ছড়াল চারদিকে। এবার মোলিমোর গতি কমে এল। আবার দিক বদলে গোনডালার দিকে যাচ্ছে সে, যাচ্ছে জলপ্রপাতের নিচে ঐতিহাসিক সভাস্থলের দিকে।

গ্রামের মেয়েরা শুনতে পেল মোলিমো আসছে। রান্নার আগুন থেকে লাফ দিয়ে সরে এল তারা, খপ করে ধরে তুলে নিল শিশুদের, ঘরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা। বন্ধ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে তারা, বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে আছে বাচ্চাকে।

গ্রামে ঢুকে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করল মোলিমো, তারপর হঠাৎ দিক বদল করল। ওজি হাবিবের স্ত্রীরা শুনতে পেল মোলিমো আসছে। ঘর ফেলে জঙ্গলে পালাল তারা। তবে ওজি হাবিব ঘর থেকে বেরুল না। মাথায় হাত দিয়ে মেঝেতে বসে থাকল সে। জানে, পালাবার কোন উপায় নেই তার। বনদেবতার শাস্তি তাকে মাথা পেতে নিতে হবে।

মোলিমো এল ঝড় তুলে। চোখের নিমেষে ওজি হাবিবের কুঁড়েটা মিশে গেল মাটির সঙ্গে। তার সমস্ত জিনিস তছনছ হয়ে গেল। কয়েক বস্তা তামাক মিশে গেল ধুলোর সঙ্গে নিঃশেষে, বোতলের মদ শুষে নিল মাটি। পায়ের ধাক্কায় তার হাতঘড়ি ছিটকে পড়ল আগুনে। নিজেকে রক্ষা করার কোন চেষ্টাই ওজি হাবিব করল না।

সবশেষে তাকে ধরল মোলিমো। হাঁটু ও কনুই দিয়ে গুঁতো মারল তাকে। দাঁত ভাঙল, নাক ভাঙল। ভাঙল পাঁজর আর আঙুল। তারপর হঠাৎই তাকে ছেড়ে বনভূমিতে ফিরে গেল মোলিমো। তার গলার সুর বদলে গেছে। করুণ বিলাপের মত শোনাচ্ছে আওয়াজটা। বনভূমিতে বিষ ঢালায়, বামবুটিরা পাপ করায় কাঁদছে মোলিমো। ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল তার কান্নার শব্দ।

আরও অনেকক্ষণ পর মেঝেতে উঠে বসল ওজি হাবিব। সঙ্গে কিছুই নিল না সে, নিল শুধু তীর আর ধনুকটা। হাতির দাঁত ও ম্যাচেটি পড়ে থাকল, খোঁড়াতে খোঁড়াতে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

একা গেল ওজি হাবিব। স্ত্রীরা এখন আর তার সঙ্গে যাবে না। কারণ তারা বিধবা হয়ে গেছে। আবার অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে হবে তাদের। ওজি হাবিব মারা গেছে। বামবুটিরা কেউ আর কোনদিন তাকে দেখতে পাবে না। এমনকি যদি তার ভূতকে বনভূমিতে ঘুরে বেড়াতে দেখে কেউ, মুখ ফিরিয়ে নেবে সে, দ্বিতীয়বার তার দিকে তাকাবে না।

তার গোত্রের দৃষ্টিতে ওজি হাবিব মারা গেছে।

'আপনি আমাদের সাহায্য করবেন, মি. রানা?' ড. শেখ ফাহিম ফয়সল জানতে

চাইলেন।

'অবশ্যই সাহায্য করব,' বলল রানা। 'টেপগুলো লণ্ডনে নিয়ে যাব আমি। লণ্ডন, প্যারিস আর নিউ ইয়র্কের পাবলিক টেলিভিশন থেকে ওগুলো প্রচার করার ব্যবস্থা করব...।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু আপনার কাছ থেকে আরও বড় সাহায্য পাব বলে আশা করি আমি,' বললেন ড. ফয়সল।

'যেমন?'

'আপনি একজন সৈনিক, অন্তত সেরকমই শুনেছি আমি। অত্যাচারীকে হটিয়ে দিয়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা ফিরে পাবার চেষ্টা করছি, আমি আশা করি আপনি আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামে সাহায্য করবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না রানা। আড়চোখে মনিকার দিকে তাকাল ও। বুঝল, ওদিক থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না।

ড. ফয়সল আবার বললেন, 'উহালিরা শান্তিপ্রিয়, আধুনিক অস্ত্র চালাবার কোন ট্রেনিং নেই তাদের। আমাদের অস্ত্রও দরকার। দরকার ট্রেনিং দেয়ার জন্যে দক্ষ লোক। উহালি তরুণদের পাবেন আপনি, আমার ডাকে কয়েক হাজার তরুণ ছুটে আসবে। কিন্তু...কে তাদের নেতৃত্ব দেবে সশস্ত্র সংগ্রামে?'

'দেখুন...,' শুরু করল রানা।

ওকে থামিয়ে দিয়ে ড. ফয়সল বললেন, 'এখুনি কিছু বলার দরকার নেই। বিছানায় শুয়ে আজ রাতে চিন্তা করুন আপনি। কাল সকালে জানান আমাকে।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন তিনি। 'গুড নাইট, মি. রানা।' ওর কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপ দিলেন তিনি, তারপর কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

'কি করবে তুমি?' খানিক পর নরম সুরে জানতে চাইল মনিকা।

'জানি না। সত্যি জানি না।' দাঁড়াল রানা। 'কাল তোমাকে জানাব। এখন আমি ড. ফয়সলের কথা মত শুতে যাচ্ছি।'

'বেশ,' বলে রানার পাশে মনিকাও দাঁড়াল। ওর খুব কাছাকাছি রয়েছে সে, মুখটা রানার দিকে তোলা। রানা তাকে চুমো খেল। দীর্ঘস্থায়ী হলো চুমোটা।

নিজেকে কয়েক ইঞ্চি সরিয়ে নিয়ে মনিকা অস্ফুটে বলল, 'এসো।' পথ দেখিয়ে রানাকে নিজের বেডরুমে নিয়ে এল সে।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল রানার। মশারির ভেতর শুয়ে আছে মনিকার পাশে। তার নগ্ন একটা বাহু ওর বুকের ওপর। ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙল তার, অনুভব করল রানা। বলল, 'ড. ফয়সলের অনুরোধ রাখব বলে ঠিক করেছি আমি।'

এক সেকেণ্ড পর মনিকা বলল, 'ব্যাপারটা ঘুষ ছিল না।'

'আমি জানি,' বলল রানা।

'কাল রাতে যা ঘটল,' বলল মনিকা, 'বহু বছর ধরে চাইছি এটা ঘটুক। সেই প্রথমবার ঘনিষ্ঠতা হবার পর থেকে। তারপর তোমাকে টিভিতে দেখে। তারপর তোমার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হবার সময়। সবশেষে এখানে। সব সময় চেয়েছি, ব্যাপারটা ঘটুক।'

'আমি কৃতজ্ঞ,' ফিসফিস করে বলল রানা। 'তোমার ভালবাসা পাওয়া আমার জন্যে পরম ভাগ্য।'

'পেয়েও এত তাড়াতাড়ি হারাতে হবে তোমাকে, আমার ভাল লাগছে না,' বলল মনিকা। 'শিগগির ফিরে এসো, রানা। তুমি পাশে না থাকলে আমার কষ্ট হবে।'

দু'দিন পর গোনজালা ত্যাগ করল রানা। লোদজি হাবিব চারজন পোর্টারকে নিয়ে ওর সঙ্গে থাকল। পাহাড়ের নিচু ঢালগুলো পেরোবার সময় বনভূমির অন্যান্য সমস্ত গাছ জায়গা ছেড়ে দিল বাঁশঝাড়কে। মাইলের পর মাইল এরপর শুধু বাঁশবন। মাথার ওপর বাঁশের ছাউনি সম্পূর্ণ নিরেট ও নিশ্ছিদ্র। কোথাও কোথাও এত ঘন, হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হলো ওদেরকে।

তারপর এক সময় পাহাড়ের উঁচু ঢালে পৌঁছুল ওরা, সী লেভেল থেকে বারোশো ফুট ওপরে। সামনে একটা গিরিপথ, সেখানে পৌঁছুবার আগেই লোদজি হাবিব আর তার দলকে ফিরে যেতে বলল রানা। কিছুক্ষণ তর্ক করার পর ওর কথা মেনে নিল লোদজি হাবিব। কথা হলো, বাঁশবনে ওর জন্যে দলবল নিয়ে অপেক্ষা করবে সে। কতদিনে ফিরবে ও, তার একটা ধারণা দিল রানা।

জ্যাকেটের পকেটে মূল্যবান কয়েকটা টেপ, বরফ ঢাকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে এবার একা এগোল রানা। লোদজি হাবিব বিদায় নেয়ার দু'দিন পর জায়ারে সীমান্ত পেরোল ও। মুতসোরা-র ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার সজ্জন ব্যক্তি, পাহাড় থেকে নেমে আসা রিফিউজিদের দেখে অভ্যস্তও বটেন। রানার পরিচয় পেয়ে যথেষ্ট সম্মান করলেন তিনি। দু'দিন পর একটা স্টিমারে তুলে দেয়া হলো ওকে। আরও দশ দিন পর লণ্ডনে পৌঁছুল রানা। টেপগুলো এখনও ওর পকেটে।

লণ্ডনে নিজের ফ্ল্যাট ও স্টুডিও থেকে উবোমোর রাজধানী কাহালিতে, মাইকেল ডাফকে ফোন করল রানা।

'গুড লর্ড, রানা। আমরা শুনলাম তুমি আর সোফিয়া ক্যারল সেঙ্গি সেঙ্গির কাছে জঙ্গলে হারিয়ে গেছ। উবোমো সেনাবাহিনী তোমাদেরকে খোঁজার জন্যে সার্চ পার্টি পাঠিয়েছে।'

'লাইনটা নিরাপদ, ডাফ?'

'খুব একটা নয়।'

'সেক্ষেত্রে দেখা হলে সব কথা শুনো। মনে আছে, তোমাকে একটা প্যাকেট রাখতে দিয়েছিলাম? ওটা এখন দরকার আমার। ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে ভরে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়।'

'থামো, রানা! ওটা তো আমি সোফিয়া ক্যারলকে দিয়ে দিয়েছি। আমাকে বলা হয়েছে, তুমিই তাকে পাঠিয়েছ!'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'বোকা মেয়ে! ওরা তাকে পুতুল বানিয়ে খেলিয়েছে। যাক, এখন আর কিছু করার নেই কারও। সে মারা

www.murchona.com amisuchon@yahoo.com

গেছে, মাইক, কোন সন্দেহ নেই।' প্যাকেটটা ওদের হাতে তুলে দিয়েছে সে, ওরা তাকে মেরে ফেলেছে।'

'ওরা কারা?'

'এখন নয়, মাইক। পরে।'

'প্যাকেটটার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত···।'

'তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। ওটার বদলে আরও কড়া ওষুধ পেয়েছি আমি।'

'তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে কখন?'

'শিগগির। তোমাকে আমি জানাব।'

হাতে সময় কম, কয়েকটা দিন রাত জেগে স্টুডিওতে কাজ করল রানা। কাজ করার সময় সোফিয়ার জন্যে নিজেকে অপরাধী মনে হলো ওর। ভিডিওর শেষ টেপটা একেবারে নিখুঁত করার কোন দরকার নেই, সোয়াহিলি সংলাপগুলো ইংরেজিতে ডাব না করলে চলে–ড. শেখ ফাহিম ফয়সলকে ইংরেজিতেই প্রশ্ন করেছে রানা, তিনিও একই ভাষায় উত্তর দিয়েছেন।

তিনদিন পর হল্যাণ্ড পার্ক-এ এল রানা। ব্রিটিশ ওভারসীজ স্টীম শিপ কোম্পানীর হেড অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল স্যার টাফ ট্যাফোর্ডের অপেক্ষায়। আধ ঘণ্টা পরই তাঁর রোলস রয়েসটাকে আসতে দেখল ও। ধাপ বেয়ে হেড অফিসে উঁচু বারান্দায় উঠছেন তিনি, রানাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'রানা···মি. মাসুদ রানা! আমি শুনেছি উবোমোয় হারিয়ে গেছেন আপনি!' তার বিস্ময় যে নির্ভেজাল, চেহারাই বলে দিল।

'সত্যি নয়, ট্যাফোর্ড। আপনি আমার মেসেজ পাননি? অন্তত ছ'বার আপনার অফিসে ফোন করেছি আমি।'

'ওরা আমাকে জানায়নি। এরকম কত ফোনই তো আসে।'

'উবোমোয় তোলা কিছু ছবি আছে আমার কাছে, আপনাকে দেখাতে চাই,' বলল রানা।

ইতস্তত করে হাতঘড়ি দেখলেন স্যার ট্যাফোর্ড।

রানা বলল, 'আমাকে এড়িয়ে গেলে নিজের ক্ষতি করা হবে, ট্যাফোর্ড। টেপগুলো আপনাকে ডুবিয়ে দিতে পারে। আপনাকে এবং আপনার কোম্পানীকে।'

চোখ দুটো সরু হয়ে গেল, কড়া সুরে স্যার ট্যাফোর্ড জানতে চাইলেন, 'শুনে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে হুমকি দিচ্ছেন?'

'না, স্রেফ সৎ পরামর্শ।'

'ঠিক আছে, আসুন ভেতরে।' সদর দরজা খুললেন তিনি। 'দেখা যাক কি নিয়ে এসেছেন।'

ডেস্কের পিছনে বসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার দেখলেন স্যার ট্যাফোর্ড, এক চুল নড়লেন না। এক সময় খালি হয়ে গেল স্ক্রীন। রানার দিকে ফিরলেন তিনি, এই প্রথম মুখ খুললেন, 'ইট'স জেনুইন। এ জিনিস নকল করা সম্ভব নয়।'

'আপনি জানেন জেনুইন,' বলল রানা। 'লগিং ও মাইনিং অপারেশন সম্পর্কে

সবই জানেন আপনি। কীর্তিটা আপনার কোম্পানীর। এ-সব আপনার নির্দেশে ঘটেছে।'

'আমি লেবার ক্যাম্প আর আর্সেনিক ব্যবহারের কথা বলছি। এ-সব ব্যাপারে কিছুই আমি জানি না।'

'কে আপনার কথা বিশ্বাস করবে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'ড. ফয়সল তাহলে বেঁচে আছেন।'

'হ্যাঁ। শুধু কি বেঁচে আছেন? আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার জন্যে একপায়ে খাড়া।'

স্যার ট্যাফোর্ড আবার প্রসঙ্গ বদলালেন। 'জানা কথা, এই টেপের আরও কপি আছে।'

'বোকার প্রশ্ন,' মন্তব্য করল রানা।

'তারমানে এটা সরাসরি একটা হুমকি?'

'এটাও,' বলল রানা।

'আপনি টেপটা টিভিতে দেখাবেন?'

'পরপর তিনটে।' গম্ভীর হলো রানা। 'অবশ্যই পাবলিককে দেখাব। শুধু একটা জিনিস আমাকে ঠেকাতে পারে। মানে, আপনি যদি আমার সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসেন।'

'কি ধরনের চুক্তিতে আপনি আসতে চান?'

'আমি আপনাকে সরে আসার জন্যে সময় দেব। উবোমোয় আপনার কোন রকম স্বার্থ থাকতে পারবে না। যে স্বার্থ আছে, তা আপনি রেড ড্রাগন বা অন্য কারও কাছে বেচে দেবেন।'

জবাব দিতে দেরি করলেন না স্যার ট্যাফোর্ড, তবে তাঁর চোখে ক্ষীণ স্বস্তির ছায়া দেখতে পেল রানা।

বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'বিনিময়ে?'

'ড. শেখ ফাহিম ফয়সলের নেতৃত্বে উবোমোয় সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হতে যাচ্ছে, এর সমস্ত খরচ আপনি যোগাবেন। এর আগেও আফ্রিকার একাধিক সশস্ত্র অভ্যুত্থানে আপনি সহযোগিতা করেছেন, আমি জানি।'

'তাতে কি রকম খরচ পড়বে আমার?'

'এই টেপটা টিভিতে দেখালে আপনার যে ক্ষতি হবে, তার তুলনায় নগণ্য। ইচ্ছে করলে আজ সন্ধ্যায় বিবিসি থেকে এটা দেখানোর ব্যবস্থা করতে পারি আমি।'

'কত?' আবার জানতে চাইলেন স্যার ট্যাফোর্ড।

'দশ মিলিয়ন পাউণ্ড, নগদ। পেমেন্ট করতে হবে একটা সুইস অ্যাকাউন্টে, কোন রকম দেরি না করে।'

'অ্যাকাউন্টটা আপনার নামে হবে?'

'আমার ও ড. ফয়সলের নামে,' বলল রানা।

'আর কি?'

'আপনার সঙ্গে জায়ারের প্রেসিডেন্টের সম্পর্ক খুব ভাল। তিনি আপনার বন্ধু,

তবে সিমন সাফারির বন্ধু নন। আমি চাই, জায়ারের সীমান্ত দিয়ে উবোমোয় কিছু অস্ত্র ঢুকবে, কিন্তু কেউ বাধা দেবে না। প্রেসিডেন্টকে আপনি বলবেন, তাঁকে শুধু ক'টা দিন চোখ বুজে থাকতে হবে।'

'ব্যস, আর কিছু নয়?'

'আর কিছু নয়।'

'ঠিক আছে, আমি রাজি,' স্যার ট্যাফোর্ড বললেন। 'অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিন, কাল বিকেলের আগেই টাকাটা জমা করব আমি।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা। 'মন খারাপ করবেন না, ট্যাফোর্ড। আপনি সব হারাননি। অত্যাচারী সিমন সাফারির জায়গায় ড. ফয়সল আসছেন, তিনি আপনার এই বদান্যতা অবশ্যই মনে রাখবেন। এবার কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকবে, তবে উবোমোয় ব্যবসা করার সুযোগ আবার আপনি পাবেন।'

রানা চলে যাবার পর পিকাসোর ছবিটার দিকে ঝাড়া পাঁচ মিনিট তাকিয়ে থাকলেন স্যার ট্যাফোর্ড। তারপর তিনি হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন। লণ্ডন আর তাইপের মধ্যে সময়ের ব্যবধান নয় ঘণ্টা। ইন্টারন্যাশনাল কোড ডায়াল করলেন তিনি, তারপর ডায়াল করলেন চঙকিঙ গঙ-এর প্রাইভেট নম্বর। তাঁর বড় ছেলে ফোন ধরলেন, রিসিভার দিলেন বাবাকে। 'খুবই ইন্টারেস্টিং একটা প্রস্তাব আছে আমার,' বৃদ্ধ চীনা ব্যবসায়ীকে বললেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'তাইপেতে আসছি আমি, আপনার সামনে বসে কথা বলব। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আসছি। আপনি থাকবেন তো?'

আরও দুটো ফোন করলেন স্যার ট্যাফোর্ড। পাইলটকে বললেন, গালফ স্ট্রীম জেট যেন তৈরি রাখা হয়। জুরিখের ক্রেডিট সুইস ব্যাংকে বলে রাখলেন, দু'নম্বর নাম্বারড অ্যাকাউন্ট থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দশ মিলিয়ন স্টার্লিং ট্রান্সফার করবেন তিনি, কোড কার্ড ইন্সট্রাকশন পাবার পর যেন দেরি করানো না হয়।

স্যার ট্যাফোর্ড ভাবছেন, ইউডিসি-র শেয়ার বিক্রি করে দেয়ার কি কারণ তিনি দেখাবেন চঙকিঙ গঙকে। বলবেন, হঠাৎ তার নগদ টাকার দরকার? কি বললে বিশ্বাস করবেন তিনি?

দামই বা কত চাওয়া যায়? বেশি চাইলে কিনতে রাজি হবেন না, আবার কম চাইলে সন্দেহ করবেন। ঠিক আছে, দামটা ঠিক করবেন প্লেনে বসে।

লেবার ক্যাম্প সম্পর্কে অবশ্যই জানতেন তিনি, তবে তাদের সঙ্গে কি ধরনের আচরণ করা হচ্ছে তা জানতেন না। আসলে তিনি জানতে চাননি। আর্সেনিক রিএজেন্ট সম্পর্কেও জানতেন না তিনি, যদিও তাঁর সন্দেহ হয়েছিল চঙমঙ গঙ জিনিসটা ব্যবহার করছেন। প্ল্যাটিনাম সংগ্রহের হার খুব বেশি দেখেই সন্দেহটা হয় তাঁর। ব্যবসাটা যেহেতু অত্যন্ত লাভজনক, কাজেই বিক্রি করতে কোন অসুবিধে হবে না, ভাবলেন তিনি।

তিন মাস পর আবার সেই বাঁশবনের কিনারায় এসে থামল রানা। ওর সঙ্গে এবার কনজো গোত্রের ছয়শো পোর্টার রয়েছে। কনজোরা পাহাড়ী এলাকায় আসা-যাওয়ায় অভ্যস্ত, ভারি বোঝাও বইতে পারে। ছয়শো লোক, প্রত্যেকে বহন করছে

আশি পাউণ্ড বোঝা।

সব মিলিয়ে ছাব্বিশ টন আর্মস অ্যাণ্ড অ্যামুনিশন–একে ফরটিসেভেন আর উজি, আরপিডি লাইট মেশিন-গান আর আরপিজি রকেট লঞ্চার, টোকারেভ অটোমেটিক পিস্তল আর আমেরিকান এম-টোয়েন্টিসিক্স ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড।

সঙ্গে করে চারজন ইন্সট্রাকটর-ও নিয়ে এসেছে রানা। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে জিম্বাবুয়ে যেতে হয়েছিল ওকে। তারা সবাই কালো, সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলতে পারে। ইন্সট্রাকটরদের লিডার একজন ম্যাটাবেল বীর, নাম রাহান ফেলু। রামবা মোল নামে একজন জিম্বাবুইয়ান ক্যামেরাম্যানকেও সঙ্গে করে এনেছে রানা।

বাঁশবনের কিনারায় ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল লোদজি হাবিব।

'আপনাকে দেখে আমার ভাল লাগছে, প্রিয় বাপজান। আপামণি আপনাকে তার হৃদয় পাঠিয়েছে,' রানাকে বলল সে। 'আপামণি বলেছে, তার কাছে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে আপনাকে। বলেছে, আর অপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।'

লোদজি হাবিবের লোকজন বাঁশবন কেটে চলার পথ তৈরি করে রেখেছে, ভারবাহী পোর্টারদের যাতে এগোতে কোন অসুবিধে না হয়। বাঁশবনের শেষ মাথায়, যেখানে বনভূমি শুরু হয়েছে, ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ড. ফয়সল, তাঁর সঙ্গে রয়েছে বামবুটি ও উহালি তরুণদের বিরাট একটা দল। এই তরুণরাই সিমন সাফারির বিরুদ্ধে হিটা সৈনিকদের সঙ্গে লড়াই করবে। কনজো পোর্টারদের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বিদায় করল রানা, এখান থেকে উহালি আর বামবুটিরাই বোঝা বইবে।

মনিকার মেসেজ পাবার পর কনভয়ের সঙ্গে থাকল না রানা, লোদজি হাবিবকে নিয়ে আগেই রওনা হয়ে গেল। গোনডালায় পৌঁছে, জলপ্রপাতের নিচে মনিকার সঙ্গে দেখা হলো ওর।

পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর ছুটে এসে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। খিকখিক করে হেসে উঠল লোদজি হাবিব, ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল তার হাসি।

গোনডালা জলপ্রপাতের সামনে, বনভূমির কিনারায় নতুন হেডকোয়ার্টার তৈরি করা হয়েছে ড. ফয়সলের নির্দেশে। বনভূমির আড়াল থাকায় আকাশ থেকে জায়গাটা দেখা যাবে না। দেয়ালগুলো ইটের, খড়ের ছাদ। এই মুহূর্তে একটা কামরার ভেতর উঁচু মঞ্চে বসে আছেন ড. ফয়সল, রানাকে পাশে নিয়ে।

বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে মীটিং চলছে ওদের, অনেককে এই প্রথম দেখছে রানা। সারি সারি লম্বা বেঞ্চে, মঞ্চের দিকে মুখ করে বসে আছেন তাঁরা। সব মিলিয়ে সাঁইত্রিশ জন, বেশিরভাগই উহালি গোত্রের সর্দার। ছ'জন প্রভাবশালী হিটাও রয়েছেন। সিমন সাফারি দেশের সর্বনাশ ঘটাচ্ছেন, এটা উপলব্ধি করার পর কি করা যায় ভাবছিলেন তাঁরা, এই সময় খবর পেলেন ড. ফয়সল বেঁচে

আছেন। কালবিলম্ব না করে গোনডালায় চলে এসেছেন তাঁরা, ড. ফয়সলকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সিমন সাফারিকে উৎখাত করার জন্যে সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য করবেন। ড. ফয়সল ও রানা যে প্ল্যান তৈরি করেছে, তাতে এই হিটা অফিসারদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ওদের মধ্যে দু'জন সামরিক অফিসার, একজন পুলিস অফিসার, বাকি তিনজন সরকারী কর্মকর্তা। সরকারী কর্মকর্তা তিনজন ভ্রমণ ও পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন, লাইসেন্স ও পারমিট ইস্যু করার ক্ষমতা রাখেন। ওঁদের সবার কাছ থেকে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে।

মীটিঙের ছবি তোলা শুরু হতেই নেতাদের অনেকে প্রতিবাদ জানালেন। রানা যুক্তি দেখাল, প্রতিরোধ আন্দোলনের অস্তিত্ব আছে, বিদেশে এটা প্রমাণ করতে না পারলে সাহায্য পাবার কোন আশা নেই। এরপর আর ছবি তুলতে কোন অসুবিধে হলো না রামবা মোল-এর।

মীটিঙের শুরুতেই চারজন ম্যাটাবেল ইন্সট্রাক্টর-এর সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিল রানা। নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে দাঁড়াল একজন করে ইন্সট্রাক্টর, তাদের কার কি কাজ ব্যাখ্যা করল ও। সবশেষে বলল, 'এরা চারজন হাজার হাজার তরুণকে যুদ্ধের ট্রেনিং দিয়েছেন, যুদ্ধে সেই তরুণরা প্রতিবার বিজয়ী হয়েছে। ড্রিল, জুতোর পালিশ, ইউনিফর্মের ইস্ত্রি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা মাথা ঘামাবেন না। তাঁরা শুধু আমাদের তরুণদের অস্ত্র চালাতে শেখাবেন।' শেখ ফারুক ফয়সলের দিকে তাকাল ও। 'ফারুক, এদিকে এসে বলবে, ট্রেনিঙের জন্যে কত লোক জোগাড় হয়েছে তোমার?'

গত তিন মাস ব্যস্ত সময় কেটেছে ফারুক ফয়সলের। জানাল, পনেরোশো তরুণকে রিক্রুট করেছে সে।

'ওয়েল ডান, ফারুক। আমাদের আসলে এক হাজার লোক দরকার। চারটি ইউনিট, আড়াইশো করে লোক, প্রতিটি ইউনিটের দায়িত্বে থাকবেন একজন করে ইন্সট্রাক্টর। সংখ্যাটা এর বেশি হলে গোপনীয়তা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। তবে বাকি তরুণদের নন-কমব্যাট্যান্ট ভূমিকা দেয়া যাবে।'

স্টাফ কনফারেন্স তিন দিন ধরে চলল। শেষ দিনে ইন্সট্রাক্টর ও নেতাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিল রানা।

আট

রাগ, ক্ষোভ ও ঘৃণায় দিশেহারা বোধ করছে ওজি হাবিব। কয়েক মাস হয়ে গেল বনভূমিতে একা বাস করছে সে—কোন লোকের সঙ্গে কথা হয়নি, হাসাহাসি হয়নি কোন মেয়ের সঙ্গে। গ্রাম থেকে অনেক দূরে পাতার ঘর বানিয়ে থাকছে সে, রাত জেগে স্ত্রীদের কথা ভাবে, ভাবে নিজের ভাগ্যের কথা। বিশেষ করে ছোট বউটার কথা ভুলতে পারে না সে। মাত্র ষোলো বছর

বয়স বউটার, শরীরে বাঁধ ভাঙা যৌবন।

দিনের বেলা কুঁড়েমিতে পায় তাকে, শুয়ে-বসে সময় কাটায়। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে এখনও শিকার করে বটে, তবে আগের মত আগ্রহ বা উত্তেজনাবোধ করে না। মাঝে মধ্যে কোন জলাশয়ের কিনারায় বসে গাঢ় পানির দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকে। কানে আসে হরিণের ডাক, কিন্তু ধাওয়া করার উৎসাহ নেই। একবার যাদুটি মেয়েদের একটা দলকে দেখতে পায় সে, ব্যাঙের ছাতা আর শিকড় তুলতে এসেছিল। পাখির মত কিচিরমিচির করছিল তারা, হেসে গড়িয়ে পড়ছিল পরস্পরের গায়ে। হামাগুড়ি দিয়ে কাছাকাছি চলে এল সে, আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখল তাদের। মনে হলো, বুকটা ফেটে যাবে তার। ইচ্ছে হলো ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু জানে তা কোনদিন সম্ভব হবে না। তাকে দেখলেই ছুটে পালাবে মেয়েরা, কেউ তার সঙ্গে একটা কথাও বলবে না।

তারপর একদিন একদল লোকের পায়ের ছাপ দেখতে পেল ওজি হাবিব। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পর বুঝল, দলটায় বিশজন ছিল। বনভূমির এই এলাকায় বামবুটি ছাড়া অন্য কোন গোত্রের লোক আসবে না, কারণ তারা বনদেবতা ও অশান্ত আত্মাদের সাংঘাতিক ভয় পায়। ওজি হাবিব কৌতূহলী হয়ে উঠল। ব্যাপারটা কি জানা দরকার। কারা তারা? কোত্থেকে এল, গেলই বা কোথায়?

ছাপগুলো অনুসরণ করল সে। কয়েক ঘণ্টা পর পেয়েও গেল দলটাকে। তারপর আশ্চর্য একটা ব্যাপার আবিষ্কার করল ওজি হাবিব।

গভীর বনভূমির মাঝখানে একটা ক্যাম্প দেখতে পেল সে। জায়গাটায় অনেক লোক জড়ো হয়েছে। তাদের সবার কাছে একটা করে বন্দুক। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল ওজি হাবিব। লোকগুলো এক সারিতে দাঁড়িয়ে বন্দুক ছুঁড়ছে। এলাকার সব পাখি আর বানর পালিয়ে যাচ্ছে।

লোকগুলো হিটা গোত্রের নয়, বুঝতে পেরে ওজি হাবিবের বিস্ময় আরও বাড়ল। তার জানা মতে, একমাত্র হিটাদের কাছেই বন্দুক থাকার কথা। উহালিরা শান্তিপ্রিয় ভালমানুষ, অস্ত্র ধরতে ভয় পায়। অথচ এই লোকগুলো সবাই উহালি।

ক্যাম্পটা দেখার পর বেশ কদিন অন্যমনস্ক থাকল ওজি হাবিব। মোলিমো তাকে শান্তি দেয়ার পর এই প্রথম তার মাথা ঠিকমত কাজ শুরু করল। চাখার সিং-এর কথা মনে পড়ল তার, ভাবল সশস্ত্র লোকগুলোর কথা বললে শিখ লোকটা তাকে তামাক দেবে কিনা। তামাকের কথা ভাবতেই জিভে পানি এসে গেল তার। অনেকদিন হলো তামাক নেই তার কাছে, যদিও নেশাটা রয়েই গেছে।

পরদিন চাখার সিংকে খুঁজতে বেরুল সে। অনেক দিন পর গান ধরল একটা, শিস দিল, গলা ছেড়ে হাসল আপনমনে। মোলিমো তাকে মেরে ফেলার পর আবার জ্যান্ত হয়েছে সে। পথে একবারই থামল, একটা বানর মারার জন্যে। আগ্রহ ফিরে পাওয়ায় শিকারে তার দক্ষতাও ফিরে এসেছে। নতুন বিষ মাখানো তীর ছুঁড়ে অনায়াসে মেরে ফেলল বানরটাকে, মাত্র দশ গজ দূর থেকে। তীর খেয়ে এক ডাল থেকে আরেক ডালে লাফ দিয়ে ছুটে পালাল বানরটা, তবে বেশি দূর যেতে পারল না, বিষক্রিয়া শুরু হতে অবশ হয়ে গেল তার শরীর, ডাল থেকে

খসে পড়ল মাটিতে। বিষের ব্যথায় থরথর করে কাঁপতে লাগল শিকার, তারপর মারা গেল। এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে ওজি হাবিব–মাংসও সংগ্রহ হলো, নতুন মাখানো বিষটাও পরীক্ষা করা হলো।

পেট ভরে মাংস খেল ওজি হাবিব, ভেজা ছালটা ভরে নিল জালের ভেতর, তারপর আবার রওনা হলো।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে চাখার সিং-এর জন্যে দু'দিন অপেক্ষা করল সে। বনভূমির এই ফাঁকা জায়গাটা এক সময় লগিং ক্যাম্প ছিল, এখন আগাছায় ভরে গেছে। চাখার সিং আসছে না দেখে চিন্তায় পড়ে গেল ওজি হাবিব। তবে কি মেইন হাইওয়ের দোকানদার লোকটাকে বিশ্বাস করা উচিত হয়নি তার? লোকটা কি চাখার সিংকে পৌঁছে দেয়নি খবরটা? তা হয় কি করে, এর আগে তো প্রতিবার তার মাধ্যমেই চাখার সিংকে খবর পাঠিয়েছে সে।

আবার দোকানদারদের কাছে ফিরে যাবে কিনা ভাবছে ওজি হাবিব, দ্বিতীয় দিন বিকেলে হাজির হলো চাখার সিং। দূর থেকে ল্যাণ্ডরোভারের আওয়াজ পেল সে, নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

ওজি হাবিব স্মরণ করল, চাখার সিং কতবার তাকে ঠকিয়েছে। দেবে বলে কত জিনিস দেয়নি। ওজনে সব সময় কম হয়েছে তামাক। নেশার পানি ভরা বোতলের সংখ্যাও কোনবার ঠিক থাকেনি।

তারপর সে স্মরণ করল, হাতিটাকে মারতে চাখার সিংই বাধ্য করেছে তাকে। সে অনুভব করল, প্রচণ্ড রাগে কাঁপছে তার শরীর। তার ওপর মোলিমোর অভিশাপ নেমে এসেছে, সেজন্যে চাখার সিংই দায়ী। চাখার সিংই তার আত্মাকে খুন করেছে।

বনভূমির গভীরে সশস্ত্র লোকগুলোর কথা ভুলে গেল ওজি হাবিব। ভুলে গেল তার তামাক দরকার। চাখার সিং-এর জন্যে অপেক্ষায় থাকল সে।

কাদা মাখা ল্যাণ্ডরোভার ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ল ফাঁকা জায়গাটায়। থামল গাড়িটা, দরজা খুলে নিচে নামল চাখার সিং।

বনভূমির চারপাশে চোখ বুলাল সে, সাদা রুমাল বের করে ঘাম মুছল মুখের। আড়াল থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে ওজি হাবিব। চাখার সিং আগের চেয়ে খানিকটা মোটা হয়েছে বলে মনে হলো তার। হাতটা হারাবার আগে আরও অনেক রোগা ছিল সে। তার শার্টটা পিঠের দিকে ভিজে রয়েছে।

রুমালটা পকেটে রেখে দিয়ে মাথার পাগড়িটা ঠিকঠাক করে নিল চাখার সিং। তারপর গলা জড়িয়ে বলল, 'ওজি হাবিব! বেরিয়ে এসো।'

অদম্য হাসিতে কেঁপে কেঁপে উঠল ওজি হাবিবের শরীর, তবে কোন শব্দ হলো না। নিচু গলায় বিড়বিড় করল সে, 'ওজি হাবিব! বেরিয়ে এসো।'

চেহারায় বিরক্তি, বনভূমির চারদিকে দৃষ্টি বোলাল চাখার সিং। খানিক পর ট্রাউজারের জিপার খুলে ঝোপের ওপর প্রস্রাব করল সে। কাজটা শেষ করে হাতঘড়ির দিকে তাকাল। 'ওজি হাবিব, তুমি এখানে আছো?' জানতে চাইল সে।

জবাব দিল না ওজি হাবিব।

রাগের সঙ্গে কি যেন বলল চাখার সিং। বুঝল না ওজি হাবিব, তবে ধরে নিল

তাকে গাল দিচ্ছে লোকটা।

'আমি তাহলে চলে যাচ্ছি,' চিৎকার করল চাখার সিং। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে পা বাড়াল ল্যাণ্ডরোভারের দিকে।

'হে প্রভু!' এবার সাড়া দিল ওজি হাবিব। 'আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি! আপনি যাবেন না!'

আধপাক ঘুরে বনভূমির দিকে তাকাল চাখার সিং। 'কোথায় তুমি?' চিৎকার করল সে।

'আমি এখানেই আছি, প্রভু। আপনার কাছে মহামূল্যবান, এমন একটা জিনিস আছে আমার কাছে। সেটা পেলে আপনি আনন্দে নাচতে শুরু করবেন।'

'কি সেটা?' জানতে চাইল চাখার সিং। 'কোথায় তুমি?'

'এই তো আমি এখানে,' ছায়া থেকে বেরিয়ে এল ওজি হাবিব, তার কাঁধের ওপর উঁকি দিচ্ছে তীর ও ধনুক।

'এটা কি ধরনের ঠাট্টা, শুনি?' খেঁকিয়ে উঠল চাখার সিং। 'তুমি লুকাচ্ছ কেন?'

'লুকাব কেন, পৌঁছুলামই তো এই মাত্র। আমাকে চিনতে পারছেন না, প্রভু? আমি তো আপনার সেই পুরানো ভৃত্য। হুজুর, আপনাকে আমি একটা অসম্ভব দামী জিনিস উপহার দিতে চাই।'

'কি উপহার? হাতির দাঁত?' জানতে চাইল চাখার সিং, লোভে চকচক করছে চোখ দুটো।

'হাতির দাঁত নয়, তারচেয়েও দামী। এ জিনিস আপনি জীবনে খুব কমই দেখেছেন।'

'কই, দেখাও আমাকে।'

'দেখাব, কিন্তু আগে বলুন, আপনি আমাকে তামাক দেবেন?'

'দেব, তবে উপহারটা আগে দেখব।'

'কতটা দেবেন, প্রভু? কতটা তামাক পাব আমি?'

'আগে উপহারটা দেখাও। সত্যি সেটা দামী কিনা বুঝতে হবে আমাকে।'

'ঠিক আছে, আসুন তাহলে। চলুন, দেখাই আপনাকে।'

'কোথায় সেটা? কত দূরে?'

'কাছেই, বেশি দূরে নয়–ওই ওখানে।' হাত তুলে আকাশের গায়ে দু'আঙুলে একটা বৃত্ত রচনা করল ওজি হাবিব। চাখার সিং আন্দাজ করল, হাঁটা পথে এক ঘণ্টা লাগবে পৌঁছুতে। তার চেহারায় দ্বিধা ফুটে উঠল।

'শুধু দামী নয়, অদ্ভুত সুন্দর একটা জিনিস,' লোভ দেখাল ওজি হাবিব। 'দেখলেই আপনি মজে যাবেন। এত খুশি হবেন যে আমি না চাইতেই পুরস্কার দ্বিগুণ করে দেবেন।'

'ঠিক আছে,' দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলল চাখার সিং। 'চলো, দেখাও তোমার উপহার।'

ওজি হাবিব ধীর গতিতে এগোল, তার ঠিক পিছনে থাকার সুযোগ দিচ্ছে চাখার সিংকে। বনভূমির গভীর থেকে গভীরতম এলাকায় প্রবেশ করল সে,

তারপর একই জায়গাকে ঘিরে চক্কর দিল বারবার। একটা ঝর্ণা দু'বার পেরুল সে, চাখার সিং বুঝতেই পারল না। বনভূমির ভেতর সূর্য নেই, মাটির চিহ্ন ও নদী দেখে পথ চিনতে হয় মানুষকে।

একই নদী চাখার সিংকে দু'বার দেখাল ওজি হাবিব, নদীর ধারে দু'বার দু'দিক থেকে এল। ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে শিখ লোকটা, খুদে পিগমির পিছু পিছু অন্ধের মত এগোচ্ছে, দূরত্ব বা দিক সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই।

দু'ঘণ্টা পর দেখা গেল দর দর করে ঘামছে চাখার সিং। ধপাস করে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পড়ল সে। 'আর কত দূর?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল সে।

'খুব কাছে,' তাকে আশ্বস্ত করল ওজি হাবিব।

'এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিই আমি,' পকেট থেকে রুমাল বের করে বলল চাখার সিং। মুখ মোছার পর আবার যখন চোখ তুলল, ওজি হাবিব অদৃশ্য হয়ে গেছে।

চাখার সিং ভয় পায়নি। বামবুটির এ-ধরনের আচরণের সঙ্গে পরিচয় আছে তার। হঠাৎ অদৃশ্য বা উদয় হওয়া তার একটা স্বভাব। 'ওজি হাবিব, ফিরে এসো এদিকে,' নির্দেশ দিল সে।

কিন্তু ওজি হাবিব সাড়া দিল না।

গাছের গুঁড়ির ওপর অনেকক্ষণ বসে থাকল চাখার সিং। মাঝে মাঝে পিগমি লোকটাকে ডাকল সে। প্রতিবার তার গলা আরও চড়ছে। ধীরে ধীরে একটা আতংক গ্রাস করছে তাকে।

আরও এক ঘণ্টা কাটল। এবার কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করছে সে। 'ওজি হাবিব, ভাই আমার! যা চাইবে তা-ই দেব তোমাকে আমি। প্লীজ, ভাই! তোমার চেহারাটা একবার দেখাও আমাকে!'

হেসে উঠল ওজি হাবিব। তার হাসির শব্দ গাছগুলোর মাঝখানে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। লাফ দিয়ে দাঁড়াল চাখার সিং, উদভ্রান্তের মত ঘুরল চারপাশে, এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর হাসির শব্দ লক্ষ্য করে ছুটল সে।

হাসির আওয়াজ থেমে গেল, থেমে গেল চাখার সিংও। এবার আরেক দিক থেকে এল শব্দটা। আবার সেদিকে পা বাড়াল চাখার সিং। সারাক্ষণ চিৎকার করছে সে, 'ওজি হাবিব, আমার কাছে ফিরে এসো!' হাসিটা এবার যেন আরও দূর থেকে ভেসে এল। ছ্যাঁৎ করে উঠল চাখার সিং-এর বুক। সে বুঝল, তাকে একা ফেলে চলে যাচ্ছে ওজি হাবিব। ছুটল সে।

ছুটতে ছুটতে এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল চাখার সিং। নিজের চারপাশে তাকাল। ঘামে ভিজে গেছে তার সারা শরীর। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে। ঠাণ্ডা, সাঁতসেঁতে বাতাসে বিদ্রূপাত্মক হাসির শব্দ তার মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে শব্দটা অনুসরণ করে এগোল, হোঁচট খেতে খেতে। এ যেন সামান্য একটু ধোঁয়া বা একটা চঞ্চল প্রজাপতিকে ধাওয়া করা। আওয়াজটা একবার আসছে ডান দিক থেকে, আরেকবার বাম দিক থেকে, কখনও পিছন থেকে,

আবার কখনও সামনে থেকে।

আতংক ও ক্লান্তিতে অবশ হয়ে এল চাখার সিং। বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সে, পড়িমরি করে উঠে আবার ছুটল। এখন সে কাঁদছে। আলগা হয়ে গেল পাগড়িটা, একটা ডালে বেধে যাওয়ায় খসে পড়ল মাথা থেকে। সেটা কুড়োবার জন্যে থামল না সে। মাথা ভর্তি চুল আর মুখ ভর্তি দাড়ি ভিজে গেছে ঘামে, বাতাসে উড়ছে পিছন দিকে। আতংকে চিৎকার করছে সে। তার চিৎকার যত বাড়ছে ততই দূরে সরে যাচ্ছে ওজি হাবিবের হাসির আওয়াজ। তারপর এক সময় শব্দটা আর শুনতে পেল না সে।

মাটিতে হাঁটু গেড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল চাখার সিং। 'প্লীজ, ভগবানের দোহাই!' বিড়বিড় করছে সে, চিৎকার করার শক্তি নেই। 'এখানে আমাকে ফেলে যেয়ো না!'

তার আবেদনে সাড়া দিল না কেউ।

দু'দিন তাকে অনুসরণ করল ওজি হাবিব। সারাক্ষণ কাঁদতে কাঁদতে হাঁটল চাখার সিং, বারবার হোঁচট খেল, করুণ সুরে প্রাণ ভিক্ষা চাইল। প্রতি ঘণ্টায় তাকে আরও দুর্বল হতে দেখল সে। একবার একটা ঝর্ণার পানিতে পড়ে গেল চাখার সিং, অনেকক্ষণ উঠল না। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। গায়ের কাপড়চোপড় বলতে প্রায় কিছুই নেই, ঝোপের তীক্ষ্ণ কাঁটা লেগে ছিঁড়ে গেছে সব, তারপর খসে পড়েছে। পোকামাকড়ের কামড় খেয়ে ফুলে উঠেছে চামড়া, লালচে দাগে ভরে গেছে নগ্ন গা। প্রায় সারা শরীর থেকেই রক্ত ঝরছে। ক্ষতগুলোর লোভে ঝাঁক ঝাঁক মাছি সারাক্ষণ অনুসরণ করছে তাকে।

দ্বিতীয় দিন বিকেলের দিকে তার সামনে এল ওজি হাবিব। মেয়েলি চিৎকার বেরিয়ে এল চাখার সিং-এর গলা থেকে, মাটি ছেড়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে। 'আমাকে একা ফেলে চলে যেয়ো না, ওজি হাবিব! প্লীজ! যা চাও তাই দেব। প্লীজ!'

'আপনার মতই, আমিও একা,' চাখার সিংকে বলল ওজি হাবিব, ঘৃণায় থুথু ফেলল সে। 'আমি মারা গেছি। মোলিমো আমাকে মেরে ফেলেছে। আপনি কথা বলছেন একজন মরা মানুষের সঙ্গে, একটা ভূতের সঙ্গে। আপনি যাকে খুন করেছেন তার ভূত আমি। একটা ভূতের কাছে আপনি দয়া চাইতে পারেন না।'

শান্তভাবে ছোট্ট ধনুকটায় তীর লাগাল ওজি হাবিব। তীরের ডগায় চকচক করছে কালো বিষ।

বোকার মত হাঁ করে থাকল চাখার সিং। 'কি করছ তুমি?' কাঁদো কাঁদো গলায় জানতে চাইল সে। তীরের ডগায় বিষ রয়েছে, দেখতে পাচ্ছে সে। এই বিষ সম্পর্কে জানা আছে তার। জানে, বামবুটিদের এই বিষ মাখানো তীর বিঁধলে জঙ্গলের প্রাণীরা কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যায়।

ধনুকটা তুলল ওজি হাবিব, তীর টেনে চিবুকের কাছে নিয়ে এল।

'না!' হাত তুলে তীরটাকে ঠেকাতে চেষ্টা করল চাখার সিং।

ধনুক থেকে ছুটে এল সেটা। ওজি হাবিব লক্ষ্যস্থির করেছে চাখার সিং-এর বুকে, কিন্তু লাগল তার হাতের তালুতে। তালুর মাঝখানটা নিখুঁতভাবে ফুটো করে

ভেতরে ঢুকল তীরের ডগা, তারপর আটকে গেল।

হাঁ করে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকল চাখার সিং।

'এখন আমরা দু'জনেই মারা গেছি,' নরম সুরে বলল ওজি হাবিব, পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের ভেতর।

নড়ার শক্তি নেই, চোখে আতঙ্ক, তালুতে বেঁধা তীরটার দিকে এখনও তাকিয়ে আছে চাখার সিং। যেখানটায় বিঁধেছে, এরই মধ্যে তার চারপাশের চামড়া বেগুনি হয়ে উঠেছে বিষের প্রভাবে। এরপর শুরু হলো ব্যথা। এরকম তীব্র ব্যথা জীবনে কখনও অনুভব করেনি চাখার সিং। তার রক্তে যেন আগুন ধরে গেছে। সে অনুভব করতে পারছে, বাহু বেয়ে বুকের দিকে উঠে যাচ্ছে বিষ। ব্যথাটা আরও বাড়ছে, ফলে চিৎকার করার শক্তিও হারিয়ে ফেলল সে। শেষ একবার ওজি হাবিবকে ডাকল, কিন্তু গলা থেকে কোন আওয়াজ বেরুল না।

আরও এক মিনিট পর অসহ্য ব্যথায় মোচড় খেতে শুরু করল তার শরীর। তারপর, কোত্থেকে শক্তি পেল কে জানে, আতঙ্কিত আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে।

তার সেই আর্তনাদ শুনে মুহূর্তের জন্যে একবার থামল ওজি হাবিব। তারপর নিস্তব্ধতা নামল বনভূমিতে। আবার পা বাড়াল ওজি হাবিব।

নয়

'আমরা তৈরি,' শান্ত গলায় বলল রানা, তবে লম্বা কুঁড়ে ঘরে বসা প্রতিটি লোক শুনতে পেল ওর কথা।

গোনডালা হেডকোয়ার্টারে একমাস আগে এই লোকগুলোই মীটিং করেছিলেন, অথচ এখন তাঁদেরকে সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছে। এখন তাঁদের চেহারায় যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আত্মবিশ্বাসের ভাব ফুটে রয়েছে আগে তা ছিল না। এখন তাঁরা ট্রেনিং পাওয়া দক্ষ লোক, কাকে কি করতে হবে পরিষ্কার ধারণা রাখেন।

মীটিঙে বসার আগে ম্যাটাবেল ইন্সট্রাক্টরদের সঙ্গে কথা হয়েছে রানার। চারজনই তারা সন্তুষ্ট। অসুস্থ বা আহত না হলে ট্রেনিং ক্যাম্প ছেড়ে চলে যায়নি কেউ, বাদও পড়েনি।

'ওরা এখন আমাবুথো,' রানাকে বলেছে রাহাম ফেলু। ম্যাটাবেল ভাষায় আমাবুথো মানে বীর।

'আপনাদের সাফল্যে আমি খুশি,' ইন্সট্রাক্টরদের বলেছে রানা। 'এই অল্প সময়ের ভেতর যথেষ্ট করেছেন আপনারা।'

রানার পিছনে একটা ব্ল্যাকবোর্ড খাড়া করা হয়েছে, সেটার দিকে ফিরল ও। কাপড় দিয়ে ঢাকা রয়েছে বোর্ডটা, সেটা সরাল। 'এখানে আপনারা আমাদের যুদ্ধ

পরিকল্পনা দেখতে পাচ্ছেন। গোটা প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করব আমি। একবার নয়, বারবার, যতক্ষণ না আপনাদের সবার মুখস্থ হয়ে যায়।'

ব্ল্যাকবোর্ডের গায়ে আঙুল রাখল রানা। 'এখানে আপনাদের চারটে দল রয়েছে। প্রতি দলে আড়াইশো করে সশস্ত্র যোদ্ধা। প্রতিটি দলের কাজ আলাদা, টার্গেট আলাদা। চারটে দল, তবে টার্গেট অনেকগুলো—মেইন আর্মি ব্যারাক, এয়ারফিল্ড, বন্দর, লেবার ক্যাম্প…,' টার্গেটের তালিকাটা পড়ে যাচ্ছে রানা।

তালিকা পড়া শেষ করে বলল, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট হলো কাহালির রেডিও ও টেলিভিশন স্টেশন। মনে রাখতে হবে, সিমন সাফারির সিকিউরিটি ফোর্স অত্যন্ত দক্ষ। প্রাথমিক বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে খুব বেশি সময় নেবে না তারা। আকস্মিক হামলা চালিয়ে বেশিরভাগ টার্গেটই আমরা দখল করে নেব, কিন্তু কয়েক ঘন্টার বেশি দখলে রাখতে পারব না—যদি না সাধারণ মানুষ আমাদেরকে সমর্থন করে। সেজন্যেই জনগণের কাছে পৌঁছুতে হবে আমাদের। তা পৌঁছুতে হলে দখল করতে হবে রেডিও ও টেলিভিশন স্টেশন।

'অপারেশন শুরু হবার আগেই রাজধানীতে চলে যাবেন ড. শেখ ফাহিম ফয়সল। ওখানে তিনি পুরানো একটা বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকবেন। আমরা রেডিও ও টেলিভিশন স্টেশন দখল করা মাত্র গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসবেন তিনি, জনসাধারণের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন—তাঁর ভাষণ রেডিও ও টিভি থেকে একযোগে প্রচার করা হবে।

'সাধারণ মানুষ তাকে টিভির পর্দায় দেখামাত্র জানবে যে তিনি বেঁচে আছেন। জানবে, অত্যাচারী সিমন সাফারির বিরুদ্ধে একটা সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি। কাজেই আমরা আশা করতে পারি দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিক আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন, সমর্থন করবেন আমাদের। সিমন সাফারির স্টর্ম-ট্রুপার আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হলেও, স্রেফ সংখ্যার জোরে আমরা তাদেরকে পিষে ফেলব।

'সফল হতে হলে আরও একটা কাজ করতে হবে আমাদের। প্রথম এক ঘন্টার মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করতে হবে সিমন সাফারির। সাপকে মারতে হলে থেঁতলাতে হয় তার মাথা। সিমন সাফারি না থাকলে তার সাঙ্গপাঙ্গরা ফণা তুলতে পারবে না। আর্মিতে তার জায়গা দখল করার মত আর কেউ নেই। যাতে না থাকে তার ব্যবস্থা সিমন সাফারি নিজেই করে রেখেছেন। সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সবাইকে খুন করেছেন তিনি। গোটা ব্যাপারটা ওয়ান-ম্যান শো। তবে বিস্ময়ের আঘাত কাটিয়ে ওঠার আগেই তাঁকে আমাদের ধরতে হবে।'

'কাজটা সহজ হবে না,' বেঞ্চ ছেড়ে দাঁড়াল শেখ ফারুখ ফয়সল। 'দেখে মনে হয় তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব জোরাল। ক্ষমতা দখলের পর তাঁকে দু'বার খুন করার চেষ্টা করা হয়, দু'বারই ব্যর্থ হয় আততায়ীরা। লোকে বলতে শুরু করেছে ইদি আমিনের মত যাদু জানেন তিনি…।'

'তুমি বসো তো, ফারুক,' ধমকের সুরে বলল রানা।

'যাদু' শব্দটা উচ্চারণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক, এমনকি শিক্ষিত একদল

লোকের সামনেও। সবাই তারা আফ্রিকান, আর আফ্রিকার মাটিতে অনেক গভীর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে যাদুবিদ্যার শিকড়। উপস্থিত নেতারা যদি বিশ্বাস করেন যে সিমন সাফারি যাদু জানে, নেতৃত্ব ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

'সিমন সাফারি একটা শয়তান, যাদুকর নন। এ-কথা সবাই আমরা জানি। তিনি কোন রকম রুটিন মেনে চলেন না। প্রতিটি কাজ একেবারে শেষ মুহূর্তে রদবদল করেন। যে-কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট কোন কারণ ছাড়াই বাতিল করে দেন। এক এক রাতে এক এক স্ত্রীর সঙ্গে ঘুমান, আগে থেকে কেউ জানে না কার সঙ্গে শোবেন। খুব চালাক, তবে যাদুকর অবশ্যই নন। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, তাঁর শরীরে লাল রক্ত বইছে।'

হাততালি দিয়ে রানাকে সমর্থন করল উপস্থিত নেতারা। সবার চেহারায় আবার আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠল।

'তবে একটা রুটিন ঠিকমতই মেনে চলেন সাফারি। প্রতি মাসে অন্তত একবার ওয়েঙ্গুর মাইনিং অপারেশন দেখতে যান। মাটির তলা থেকে তাঁর সম্পদ উঠে আসছে, এটা দেখতে পছন্দ করেন ভদ্রলোক। এই ওয়েঙ্গুতেই শুধু সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকেন। গোটা দেশে এই একটা জায়গায় সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যাবে তাঁকে। আমরা ভাগ্যবান, মেজর সাবুর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পেয়েছি।' মঞ্চে, পাশে বসা হিটা অফিসারকে ইঙ্গিতে দেখাল রানা। 'আপনারা জানেন, মেজর সাবু সিমন সাফারির ব্যক্তিগত ট্রান্সপোর্ট-এর দায়িত্বে আছেন। সিমন সাফারি ওয়েঙ্গুতে সব সময় একটা পুমা হেলিকপ্টার নিয়ে যান। আগামী চোদ্দ তারিখ সোমবার তাঁর জন্যে একটা পুমাকে তৈরি রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমরা ধরে নিতে পারি, সেদিনও তিনি ওয়েঙ্গুতে যাবেন। তারমানে আমাদের হাতে মাত্র পাঁচ দিন সময় আছে তৈরি হবার···।'

পুমা হেলিকপ্টারের ফিউজিলাজে, প্যাড লাগানো বেঞ্চে প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারির পাশে বসে আছেন চঙমঙ গঙ। বনভূমির ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে পুমা, খোলা হ্যাচ দিয়ে গাছগুলোর সবুজ মাথা ঝাপসা মত দেখতে পাচ্ছেন তিনি। প্রচণ্ড বাতাস ঢুকছে ভেতরে, কথা বলার সময় গলা চড়াতে হলো।

'চাখার সিং-এর খবর কি?' চিৎকার করলেন সিমন সাফারি, তাঁর মুখ চঙমঙ গঙের কানের কাছে।

'কোন খবর নেই,' পাল্টা চিৎকার করলেন চীনা ব্যবসায়ী। 'আমরা তাঁর ল্যাণ্ডরোভারটা পেয়েছি, কিন্তু তাঁর কোন হদিশ পাইনি। দেখতে দেখতে দু'হপ্তা পার হতে চলল। ধরে নিতে হয় জঙ্গলে মারা গেছেন তিনি, রানার মত।'

'ভদ্রলোক ভাল মানুষ ছিলেন,' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'লেবার ক্যাম্পে সবাই তাঁকে ভয় করত। কিভাবে কাজ আদায় করতে হয় জানতেন তিনি। খরচ কমিয়ে রাখার কৌশলও তাঁর জানা ছিল।'

'হ্যাঁ,' একমত হলেন চঙমঙ গঙ। 'আর কাউকে দিয়ে তাঁর জায়গা পূরণ করা

সহজ হবে না। ওদের ভাষাটাও ভাল বুঝতেন তিনি। আফ্রিকা সম্পর্কে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। জানতেন কিভাবে···,' নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলেন তিনি। কালো লোকদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিলেন, সময় থাকতে সামলে নিয়েছেন নিজেকে। 'জানতেন কিভাবে মানুষকে রাজি করতে হয়।'

'মাত্র অল্প ক'দিন হলো তিনি অনুপস্থিত, অথচ এরইমধ্যে আমাদের উৎপাদন কমে গেছে। উৎপাদন কমে যাওয়া মানে লাভের পরিমাণ কমে যাওয়া···।'

'ব্যবস্থা করছি আমি,' আশ্বাস দিলেন চঙমঙ গঙ। 'তাঁর জায়গায় অন্য লোক আসছে। মাইনিং-এ অভিজ্ঞ এমন কিছু লোককে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আনার ব্যবস্থা হচ্ছে। চাখার সিং-এর চেয়ে কম নয় তারা। বর্বর শ্রমিকদের কিভাবে খাটাতে হয়, তারা জানে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সিমন সাফারি। কেবিনের আরেক দিকে এগোলেন তিনি সঙ্গিনীর সঙ্গে আলাপ করার জন্যে।

বরাবরের মত এবারও সঙ্গে একটা মেয়েকে নিয়ে এসেছেন সিমন সাফারি। তাঁর এবারের বান্ধবীটি এক হিটা তরুণী, কাহালির একটা নাইটক্লাবে নাচে ও গান গায়। যেমন লম্বা মেয়েটি তেমনি সুন্দর তার চেহারা। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের একটা দলও রয়েছে। ক্যাপটেন সোলকে পদোন্নতি দিয়ে মেজর বানানো হয়েছে, তার অধীনে পুমায় রয়েছে বিশজন ক্র্যাক প্যারট্রুপার। সোফিয়া ক্যারল অদৃশ্য হবার পর পদোন্নতি পেয়েছে সোল। সিমন সাফারি অনুগত ও বিশ্বাসী লোকদের পছন্দ করেন, তাদেরকে পুরস্কার দিতেও কার্পণ্য করেন না। তাঁর আমলে সোল যে আরও উন্নতি করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মাইনিং ও লগিং কনসেশনে প্রেসিডেন্টের এই ভিজিট একঘেয়ে লাগছে চঙমঙ গঙের। উবোমো এয়ারফোর্সের এই পুরানো পুমায় চড়তে সাংঘাতিক ভয় পান তিনি। এ-দেশের হেলিকপ্টার পাইলটরা যেমন বেপরোয়া তেমনি আনাড়ি। উবোমোয় তিনি আসার পর দুটো পুমা বিধ্বস্ত হয়েছে। আরোহীদের একজনও বাঁচেনি। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পুমায় থাকার কোন ইচ্ছেই তাঁর নেই, কিন্তু থাকতে বাধ্য করা হয় তাঁকে। তাঁর সঙ্গ না পেলে সিমন সাফারি অসন্তুষ্ট হবেন।

শুধু যে শারীরিক ঝুঁকি আছে তা নয়। পাশে থাকলে প্রেসিডেন্ট সারাক্ষণ তাঁকে উৎপাদন আর লাভের অঙ্ক সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন। সিমন সাফারির চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে মনে হয়, তাঁকে যেন তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না। মুশকিল হলো, সামরিক অফিসার হলেও হিসাবটা তিনি খুব ভাল বোঝেন। কেউ তাঁকে ঠকাবার চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে যান।

অবশ্যই চঙমঙ গঙ ব্যবসাটা থেকে কিছু চুরি করছেন, তবে মাত্রা ছাড়াচ্ছেন না। অত্যন্ত কৌশলে কাজটা করছেন তিনি, কেউ যাতে কিছু সন্দেহ করতে না

পারে। তাঁর চুরির কৌশলটা এতই সূক্ষ্ম, পাকা কোন অডিটর-ও সহজে ধরতে পারবে না। অথচ সিমন সাফারি এরইমধ্যে সন্দেহ করতে শুরু করেছেন।

আরেকটা সমস্যা হলো, তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে সিমন সাফারির কৌতূহল। নারীদেহ কেন তাঁর কাছে লোভনীয়, এ-ধরনের প্রশ্নও শুনতে হয়েছে তাঁকে। সোফিয়ার নাম উচ্চারণ করে সিমন সাফারি জানতে চেয়েছেন, কতক্ষণ বেঁচে ছিল সে।

প্যাড লাগানো বেঞ্চে একা নন চঙমঙ গঙ, তাঁর পাশে দু'জন প্যারট্রুপার বসে আছে। ওদের উপস্থিতির কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করলেন তিনি। তাঁর চুরির কৌশলে কোথাও কোন ফাঁক আছে কিনা ভাবতে শুরু করলেন।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর চঙমঙ গঙ সিদ্ধান্ত নিলেন, চুরিটা আপাতত বন্ধ রাখাই ভাল। তিনি জানেন, তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পেলে সিমন সাফারি চুক্তিটা বাতিল করতে ইতস্তত করবেন না। শুধু যে চুক্তিটা বাতিল করা হবে তা নয়, চঙমঙ গঙকে জ্যান্ত মাটির তলায় পুঁতেও ফেলা হবে। নিখোঁজ-এর তালিকায় রানা ও চাখার সিং-এর সঙ্গে আরও একটা নাম যোগ হবে–চঙমঙ গঙ।

হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেল পুমা, বেঞ্চটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরলেন তিনি। খোলা হ্যাচ দিয়ে বাইরে তাকাতে নগ্ন লাল মাটি দেখতে পেলেন, দেখতে পেলেন এক সারিতে কয়েকটা মোমু বনভূমির কিনারায় কাজ করছে। ওয়েঙ্গুতে পৌঁছে গেছেন তাঁরা।

রানা দেখল ল্যাণ্ডিং-প্যাডকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে পুমা।

প্যাড থেকে তিনশো বিশ গজ দূরে রয়েছে রানা, একটা মেহগনি গাছের মাঝখানে। গাছটায় চড়েছে রাতের অন্ধকারে। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল লোদজি হাবিব, স্নাইপার'স ইকুইপমেন্টগুলো একটা নাইলন রশিতে বেঁধে দেয় সে, রশিটা ওপরে টেনে নেয় রানা।

মেহগনি গাছটায় প্রচুর শাখা-প্রশাখা আর পাতা রয়েছে, আড়াল পেতে কোন অসুবিধে হয়নি ওর। পরগাছাগুলো পরস্পরকে এমনভাবে জড়িয়ে আছে, ভেতরে পাঁচ-সাতজন লোক লুকিয়ে থাকলেও নিচ থেকে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই। পরগাছা কেটে একটা জানালা তৈরি করেছে রানা, সেই জানালায় চোখ রেখে তাকিয়ে আছে হেলিকপ্টার প্যাড-এর দিকে। ওর পরনে পুরোদস্তুর ক্যামোফ্লেজ স্নাইপার'স ওভারঅল, মুখে পরেছে মেশ ফেস-মাস্ক। হাত দুটো সবুজ দস্তানায় ঢাকা।

রানার সঙ্গে একটা সেভেন এমএম রেমিংটন ম্যাগনাম রাইফেল রয়েছে, ১৬০ গ্রেন সফট-পয়েন্ট বুলেট ভরেছে ওটায়। গভীর জঙ্গলে হাতের টিপ ঝালাই করে নিয়েছে ও। সিমন সাফারির কোথায় গুলি করবে ইতিমধ্যে তা ঠিক করে নিয়েছে। মাথায় নয়, বুকে। বুকের ঠিক মাঝখানে লক্ষস্থির করবে ও। বুলেটটার যে বৈশিষ্ট্য, আশা করা যায় সিমন সাফারির ফুসফুস ছিঁড়ে বের করে নিয়ে যাবে।

এভাবে চিন্তা করাটা অশ্লীল, মনে মনে স্বীকার করল রানা। তারপর ভাবল,

যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। সিমন সাফারি যে একটা পশু, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু ক্ষমতালোভী নন, ভদ্রলোক আক্ষরিক অর্থেই ইতর। যাদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন তাদেরকে দেখলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যায়। তার পাশে ভাল বলতে একজন লোকও নেই।

লতাপাতার ফাঁক দিয়ে রানা দেখল, প্রধান প্রশাসনিক ভবনের সামনে এক সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একদল লোক। বেশিরভাগই তাইওয়ানিজ এঞ্জিনিয়ার ও টেকনিশিয়ান। তবে কালো ম্যানেজাররাও আছে। ওদের উপস্থিতিই আভাস দিচ্ছে, রানার পাওয়া তথ্যটা মিথ্যে নয়। শুধু সিমন সাফারিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এভাবে এক জায়গায় জড়ো হবে লোকগুলো।

পুমায় যদি সিমন সাফারি থাকেন, ধরে নেয়া যায় তাঁর সঙ্গে অবশ্যই চঙমঙ গঙ থাকবেন। ইউডিসি-র চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তিনি, এর আগে প্রতিবার কাজ দেখার জন্যে প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী হয়েছেন। রানা যদি প্রথম গুলিতে সিমন সাফারিকে মারতে পারে, তাঁকে ঘিরে থাকা দেহরক্ষীদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, দিশেহারা হয়ে পড়বে তারা সবাই, তখন দ্বিতীয় গুলিটা চঙমঙ গঙকে করার একটা সুযোগ পাবে ও।

চঙমঙ গঙকে গুলি করার সময় রানার মধ্যে কোন ইতস্তত ভাব থাকবে না। নিজেকে কঠিন করার জন্যে আলী শাহ আর তার পরিবারের স্মৃতি বুকের মাঝখানে লালন করছে ও। উবোমোয় ওর আসার পিছনে মূল কারণই চঙমঙ গঙ। দ্বিতীয় বুলেটটা তাঁর জন্যে আলাদা করে রেখেছে রানা।

তারপর আছে চাখার সিং। তবে সে যদি প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী হয়ও, তৃতীয় গুলিটা করার সুযোগ পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে রানার। প্যারট্রুপার গার্ডরা ট্রেনিং পাওয়া সৈনিক। দ্বিতীয় গুলিটা হয়তো ছোঁড়া যাবে, তারপর আর সুযোগ থাকবে বলে মনে হয় না।

চক্কর শেষ করে ল্যাণ্ডিং প্যাডে নেমে আসছে পুমা।

আয়োজন ও প্ল্যান যা করা হয়েছে, আরেকবার স্মরণ করল রানা। অবশ্য এখন আর কিছু বদলান সম্ভব নয়।

ড. শেখ ফাহিম ফয়সল কাহালি পৌঁচেছেন। একটা লগিং ট্রাকে চড়িয়ে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে তাঁকে। নিখুঁত ছদ্মবেশ নেন তিনি, ট্রাক ড্রাইভারের হেলপার–পথে কোথাও কোন অসুবিধে হয়নি। একইভাবে অস্ত্র ও গোলাবারুদও বিলি করা হয়েছে, বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইউডিসি ট্রাকে করে। মজার ব্যাপার হলো, অত্যাচারীকে উৎখাত করার জন্যে তারই পরিবহন ব্যবস্থা কাজে লাগাচ্ছে ওরা।

এই মুহূর্তে রাজধানীতে দুটো বিপ্লবী কমাণ্ডো রয়েছে, নির্দেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে হামলা করার অপেক্ষায় আছে তারা। প্রথম হামলাটা করা হবে রেডিও ও টিভি স্টুডিওতে। শেখ ফাহিম ফয়সল জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। বিদ্রোহ করার জন্যে আহ্বান জানাবেন জনগণকে। তিনি ঘোষণা করবেন সিমন সাফারি মারা গেছেন; সেই সঙ্গে সমাপ্তি ঘটেছে তাদের ভোগান্তি ও দুর্দিনের।

বাকি দুটো কমাণ্ডো দায়িত্ব পালন করবে এখানে আর সেঙ্গি সেঙ্গিতে।

প্রথম লক্ষ হবে সিমন সাফারির এসকর্টকে নিশ্চিহ্ন করে ত্রিশ হাজার বন্দীকে মুক্ত করা।

সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়েছে, এই সংকেত আসবে রানার রাইফেল থেকে। সিমন সাফারি মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে রেডিও যোগে খবরটা পৌঁছে যাবে ড. ফাহিম ফয়সল ও ফারুক ফয়সলের কাছে। ল্যাণ্ডিং-প্যাড-এর পাশে প্রশাসনিক ভবনে শক্তিশালী একটা রেডিও আছে, তবে আক্রমণ শুরু হবার পরপরই ওটার কাছে ওরা পৌঁছুতে পারবে বলে মনে হয় না। ব্যাকআপ হিসেবে ওদের কাছে একটা পোর্টেবল ভিএইচএফ ট্র্যান্সমিটার আছে, ওটার সাহায্যে গোনডালা হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। রেডিও অপারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে মনিকা, সে-ই সিগন্যাল ট্র্যান্সমিট করে জানাবে যে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়েছে।

যদি কোন সমস্যা দেখা দেয়, একাধিক বিকল্প ঠিক করা আছে, তবে সব কিছু নির্ভর করবে প্রথম গুলিতে সিমন সাফারি মারা যায় কিনা তার ওপর। রানা যদি ব্যর্থ হয়, সিমন সাফারির প্রতিক্রিয়া হবে আহত সিংহের মত হিংস্র ও ক্ষিপ্র। গোটা পরিস্থিতি তখন বদলে যাবে। রানা অবশ্য সশস্ত্র উহালি তরুণদের ওপর নির্ভর করতে পারে, তবে তার একটা সীমা আছে। মন থেকে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলল ও। সিমন সাফারিকে ওর ফেলার কথা, ওই ফেলবে।

ল্যাণ্ডিং প্যাড স্পর্শ করছে পুমা হেলিকপ্টার।

রাইফেলের বাঁটে গাল ঠেকাল রানা, টেলিস্কোপে চোখ রেখে দেখে নিল সামনের দৃশ্যটা। নাইন ম্যাগনিফিকেশন-এ সেট করা রয়েছে টেলিস্কোপ সাইট। ইতিমধ্যে প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে ল্যাণ্ডিং-প্যাড-এর কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে রিসেপশন কমিটির লোকজন। তাদের মুখ, হাসি, ঠোঁট নড়া পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও।

রাইফেল একটু ওপরে তুলল রানা, হেলিকপ্টারটা দেখতে পেল। লেন্সগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী, পুমার ফিউজিলাজে হ্যাচওয়ে ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। ফাঁকটায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার, হেলিকপ্টারের নিরাপদ অবতরণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করছে। লোকটার ওপর ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল রানা, টেলিস্কোপের ক্রস-হেয়ার রাখল তার বুকে, সেফটি স্ট্র্যাপ-এর বাকল হলো ওর লক্ষ্যস্থল।

আচমকা এঞ্জিনিয়ারের কাঁধের পিছনে আরেকটা মাথা দেখা গেল। মেরুন রঙা বেরেট, বেরেটের গায়ে চকচক করছে ক্যাপ-ব্যাজ–দীর্ঘদেহী ও সুপুরুষ সিমন সাফারি।

'এসেছে!' বিড় বিড় করল রানা। 'মরণ তাকে টেনে এনেছে এখানে!'

সাইটের ক্রস-হেয়ার উঁচু করল রানা, ওটাকে স্থির রাখার চেষ্টা করল সিমন সাফারির দুই চোখের মাঝখানে। হেলিকপ্টারের নড়াচড়া, ওর নিজের হৃৎপিণ্ড ও হাতের কাঁপন, ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের তৈরি আড়াল গুলি করতে বাধা দিচ্ছে ওকে। তবু সমস্ত মনোযোগ ও ইচ্ছাশক্তি সিমন সাফারির ওপর স্থির রাখার চেষ্টা করল রানা।

ঠিক এই সময় বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাটা আঘাত করল ওর নগ্ন ঘাড়ে। চমকে উঠল রানা, কেঁপে গেল হাত, তারপর আরেক ফোঁটা বৃষ্টি ঝাপসা করে দিল টেলিস্কোপের লেন্স। দাঁতে দাঁত চেপে ভাগ্যকে গালি দিল রানা।

শুরু হয়ে গেল ঝমাঝম বৃষ্টি। কুয়াশার মত একটা পর্দা দেখতে পাচ্ছে রানা সামনে, ও যেন একটা পাহাড়ী জলপ্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ল্যাণ্ডিং-প্যাডটা ঝাপসা হয়ে গেছে। ওখানে স্পষ্টভাবে যাদেরকে দেখা যাচ্ছিল একটু আগে, এখন তাদের আকৃতি বদলে গেছে। প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে যারা এসেছে, সবাই তারা রঙিন ছাতা খুলে এগিয়ে এল তাঁর দিকে। কে সবার আগে প্রেসিডেন্টের মাথায় ছাতা ধরতে পারবে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

রঙিন ছাতাগুলো বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে রানার দৃষ্টিকে। সিমন সাফারির ভাঙাচোরা একটা আকৃতি হ্যাচওয়েতে দেখতে পেল ও, নিচে নামার চেষ্টা করছে। রানা আশা করেছিল, হ্যাচওয়েতে দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন তিনি। বৃষ্টি এসে সব ভেস্তে দিল। হ্যাচওয়ে থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন প্রেসিডেন্ট, তারপর ছাতা আর লোকজনের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। হারিয়ে গেলেও, মাঝে মধ্যে তাঁর মাথাটা দু'এক সেকেণ্ডের জন্যে দেখতে পাচ্ছে রানা। ক্রস-হেয়ারটা তাঁর ওপর স্থির রাখতে চাইছে ও। মাত্র দু'সেকেণ্ড স্থায়ী একটা সুযোগ পাওয়াও গেল। ট্রিগার টেনে রেখেছে ওর আঙুল, চাপ বাড়াতে যাবে এই সময় একটা ছাতা এসে আড়াল করে দিল সিমন সাফারির মাথা।

হ্যাচওয়েতে দেখা গেল ঝাপসা আরেকটা মূর্তি, রানার মনোযোগ নড়িয়ে দিল। প্রথমে সন্দেহ হলো, তারপর চিনতে পারল–চণ্ডমণ্ড গণ্ড। ঝট করে তাঁর দিকে রাইফেল ঘোরাল, পরমুহূর্তে সাবধান করল নিজেকে। প্রথম অবশ্যই সিমন সাফারিকে মারতে হবে। মরিয়া হয়ে টেলিস্কোপটা বারবার এদিক ওদিক ঘোরাল রানা, টার্গেটকে ক্রস-হেয়ারে ধরে রাখতে চাইছে। এখনও অভ্যর্থনা কমিটির লোকজন ঘিরে রেখেছে তাঁকে, ভিড়টা তাঁকে নিয়ে সরে যাচ্ছে দূরে, ভিড়ের মাথায় গিজগিজ করছে রঙিন ছাতা। এত জোরে বৃষ্টি পড়ছে যে প্রতিটি ফোঁটা কংক্রিটে লেগে বিস্ফোরিত হচ্ছে।

ভিজে গোসল হয়ে গেল রানা, মাস্কের ভেতরও ঢুকে পড়েছে পানি।

হেলিকপ্টার থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল হিটা প্যারাট্রুপাররা, ভিড় ঠেলে এগোল তারা, ঘিরে ফেলল তাদের প্রেসিডেন্টকে। সিমন সাফারিকে এখন দেখাই যাচ্ছে না, সবাই এখন অপেক্ষারত ল্যাণ্ডরোভারগুলোর দিকে ছুটছে, ছাতার নিচে নিচু করে রেখেছে মাথা। পায়ের আঘাতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এরইমধ্যে জমে ওঠা বৃষ্টির পানি।

আবার দেখা গেল সিমন সাফারিকে, বৃষ্টির মধ্যে দ্রুত পায়ে এগোচ্ছেন, এগোচ্ছেন অপেক্ষারত প্রথম গাড়িটার দিকে। টার্গেট হাঁটার মধ্যে থাকলে, সেভেন এমএম বুলেটের ভেলোসিটির কথা মনে রেখে রানাকে গুলি করতে হবে অন্তত দু'ফুট সামনে। ঝাপসা লেন্সের ভেতর দিয়ে কোন রকমে তাঁকে দেখতে

পাচ্ছে ও। এই পরিস্থিতিতে লক্ষ্যভেদ করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ, তবু ট্রিগারের ওপর চাপ বাড়াল রানা, ঠিক যখন একজন হিটা দেহরক্ষী ছুটে তার মনিবের সামনে চলে এল।

নিজেকে সামলাবার আগেই বেরিয়ে গেল গুলি। হিটা প্যারট্রুপারকে আধপাক ঘুরে পড়ে যেতে দেখল রানা। গুলিটা তার বুক ভেদ করে গেছে। সে ওখানে না থাকলে সিমন সাফারির অবস্থা তার মতই হত।

ছুটন্ত মানুষদের গোটা ছকটা বিস্ফোরিত হলো। হাতের ছাতা ফেলে দিয়ে সামনের দিকে খিঁচে দৌড় দিলেন সিমন সাফারি। তাঁর চারপাশে সবাই দিশেহারার মত ছুটোছুটি করছে।

রাইফেলের চেম্বারে আরেক রাউণ্ড ভরে আবার গুলি করল রানা, সরাসরি সিমন সাফারিকে। সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করা হয়নি, কাজেই লাগল না। আগের মতই প্রাণপণে দৌড়াচ্ছেন তিনি। পৌঁছে গেলেন ল্যাণ্ডরোভারের কাছে, রানা আবার লোড করার আগে হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন সামনের সীটে।

ভিড়ের মধ্যে চণ্ডমণ্ড গণ্ডকে দেখতে পেয়ে গুলি করল রানা। আরেকজন প্যারাট্রুপারকে পড়ে যেতে দেখল ও, শরীরের নিচের দিকে গুলি খেয়েছে। এরপর বাকি সৈনিকরা বনভূমির কিনারা লক্ষ্য করে উদভ্রান্তের মত ছুটতে শুরু করল, বুঝতে পারেনি রানা কোনদিক থেকে গুলি করছে।

এখনও রানা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে সিমন সাফারিকে লক্ষ্য করে আরেকটা গুলি ছোঁড়ার। কিন্তু ইতিমধ্যে চলতে শুরু করেছে ল্যাণ্ডরোভার। উইণ্ডস্ক্রীনের পিছনে একটা মাথা দেখে ট্রিগারে টান দিল ও, জানে না মাথাটা প্রেসিডেন্টের নাকি ড্রাইভারের। চুরমার হয়ে গেল উইণ্ডস্ক্রীন, তবে ল্যাণ্ডরোভার থামল না বা ঝাঁকি খেল না।

ছুটন্ত গাড়িটার ওপর ম্যাগাজিন শেষ করল রানা। তারপর কোমরে জড়ানো বেল্ট থেকে বুলেট নিয়ে রিলোড করতে যাবে, দেখল গুলি খেয়ে ছিটকে পড়ল তিন-চারজন হিটা গার্ড ও প্রশাসনিক অফিসার। তারপর এক সঙ্গে গর্জে উঠল কয়েকটা পিস্তল।

পেরিমিটারের বাইরে, জঙ্গলের ভেতর নিজেদের পজিশন থেকে উহালি তরুণরা গুলি বর্ষণ শুরু করেছে।

সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়েছে, কিন্তু সিমন সাফারি এখনও বেঁচে।

রানা দেখল বিরাট একটা বৃত্ত তৈরি করল ল্যাণ্ডরোভার, পাশ কাটাল অফিস ভবনটাকে, ঘুরে ফিরে আসছে প্যাড ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়া হেলিকপ্টারের দিকে। পুমাকে নিয়ে বিশ ফুট ওপরে উঠে গেছে পাইলট, ল্যাণ্ডিং-প্যাড-এর ওপরই স্থির হয়ে রয়েছে। বৃষ্টি একটা পর্দার মত আড়াল করে রেখেছে ওটাকে।

ড্রাইভারের জানালা দিয়ে মাথা বের করলেন সিমন সাফারি, আবার তাঁকে তুলে নেয়ার জন্যে উন্মাদের মত ইঙ্গিত করছেন পাইলটের উদ্দেশে।

এই সময় জঙ্গলের কিনারা থেকে ফাঁকা জায়গাটার দূর প্রান্তে বেরিয়ে এল একঁ লোক। এতটা দূর থেকেও ম্যাটাবেল ইন্সট্রাকটর রাহান ফেলুকে পরিষ্কার

চিনতে পারল রানা। সে তার কাঁধে আরপিজি রকেট-লঞ্চারের একটা টিউব বহন করছে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ছুটে সামনে চলে আসছে রাহান ফেলু।

হিটা গার্ডদের কেউ এখনও তাকে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। শূন্যে ঝুলে থাকা পুমার একশো কদমের মধ্যে চলে এল রাহান ফেলু, মাটিতে একটা হাঁটু গাড়ল, স্থির ও শক্ত করল নিজেকে, তারপর ফায়ার করল একটা রকেট।

সাদা ধোঁয়ার লেজ বের করে ছুটল রকেট। হিস হিস শব্দ হলো বাতাসে। পুমার সামনের দিকে আঘাত করল সেটা।

ধোঁয়া আর শিখার বিস্ফোরণে ককপিট ঢাকা পড়ে গেল। অলস ভঙ্গিতে ডিগবাজি খেতে শুরু করল হেলিকপ্টার, প্যাডের ওপর পড়ল পিঠ দিয়ে। কংক্রিটের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ঘূরন্ত রোটর। এক মুহূর্ত পর আগুন ও ধোঁয়ার একটা বিরাট বল লাফ দিয়ে উঠল, ঢেকে ফেলল যান্ত্রিক ফড়িংটাকে।

লাফ দিয়ে সিধে হলো রাহান ফেলু, ঘুরেই ছুটল বনভূমির কিনারা লক্ষ্য করে। কিন্তু তার আর ফিরে যাওয়া হলো না। নিরাপদ আড়ালে পৌঁছুবার আগেই হিটা গার্ডরা গুলি করে ফেলে দিল তাকে।

লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা। সিমন সাফারির পালিয়ে যাবার পথ বন্ধ করে গেছে সে।

যদিও প্রায় এক মিনিটের মত সময় লাগল, তবু বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে হিটা সৈনিকরা। ল্যাণ্ডরোভারে উঠে পড়েছে তারা, অনুসরণ করছে সিমন সাফারিকে। সিমন সাফারির ল্যাণ্ডরোভার অফিস ভবনকে ছাড়িয়ে সামনের রাস্তায় উঠে পড়েছে। আক্রমণকারীদের সংখ্যা ও শক্তি সম্পর্কে নি য়ই একটা ধারণা পেয়ে গেছেন তিনি, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাঁচতে হলে সেঙ্গি সেঙ্গি রোড ধরে সবচেয়ে কাছের একটা রোড-ব্লকে পৌঁছুতে হবে তাঁকে। ওখানে তাঁর নিজের লোকজন আছে।

তাঁর লোকদের নিয়ে বাকি ল্যাণ্ডরোভারগুলোও পিছু পিছু আসছে।

সিভিলিয়ান অফিসাররা বেশিরভাগই শুয়ে পড়েছে মাটির ওপর, এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ থেকে গা বাঁচাবার চেষ্টায়। তবে কিছু লোক অফিস ভবনে আশ্রয় পাবার জন্যে ছুটছে এখনও। তাদের মধ্যে চণ্ডমণ্ড গণ্ডকেও দেখতে পেল রানা। তার পরনের নীল সাফারি সহজেই দৃষ্টি কেড়ে নিল। লক্ষ্যস্থির করে গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেল না রানা, তার আগেই একটা ভবনের সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন তিনি।

আবার ল্যাণ্ডরোভারগুলোর দিকে তাকাল রানা। সব মিলিয়ে মোট চারটে গাড়ি। এরইমধ্যে মেইন হাইওয়েতে প্রায় পৌঁছে গেছে ওগুলো। উহালি কমাণ্ডোরা গুলি করছে বটে, তবে একটাও লাগছে না। রাহান ফেলু মারা যাবার পর নিজেদের ট্রেনিং যেন ভুলে গেছে তারা, গুলি করছে লক্ষ্যস্থির না করেই।

মেহগনি গাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে সিমন সাফারির ল্যাণ্ডরোভার,

রেঞ্জের অনেক বাইরে। উবোমোর সামরিক প্রশাসক শেষ পর্যন্ত রানাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে পারছেন। গোটা আক্রমণটাই ব্যর্থ হতে চলেছে। উহালি তরুণরা সব ভুলে বসে আছে। প্ল্যান অনুসারে কোন কাজই হচ্ছে না এখন। শুরু হতে না হতে ভেস্তে গেছে সশস্ত্র বিপ্লব।

হতাশার কালো ছায়া পড়ল রানার চেহারায়। এরপর কি ঘটবে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল ও।

দশ

জঙ্গল থেকে হঠাৎ হলুদ একটা প্রকাণ্ড ক্যাটারপিলার ট্র্যাক্টর হেলেদুলে বেরিয়ে এল। চোখ মিটমিট করে বৃষ্টির পানি সরাল রানা, বিড় বিড় করে বলল, 'একজন অন্তত মনে রেখেছে এই পরিস্থিতিতে কি করতে হবে।' নিজের ওপর রাগ হচ্ছে ওর, এই ব্যর্থতার জন্যে একা নিজেকে দায়ী করছে ও।

ক্যাটারপিলার ট্র্যাক্টর অলসভঙ্গিতে তির্যক একটা পথ ধরে হাইওয়ের দিকে যাচ্ছে, ল্যাণ্ডরোভারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। ওটার পিছু পিছু জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে উহালিদের ছোট একটা দল, ছুটছে তারাও, তাদের সবার পরনে নীল ডেনিম। ট্র্যাক্টরটাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছে তারা, গুলি করছে সামনের ল্যাণ্ডরোভারকে লক্ষ্য করে।

কাছাকাছি থেকে, কাজেই এবার তাদের গুলি একেবারে ব্যর্থ হলো না। ট্র্যাক্টরটা পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে, দেখতে পেয়ে ল্যাণ্ডরোভার ঘুরিয়ে নিলেন সিমন সাফারি। বাকি ল্যাণ্ডরোভারগুলোও অনুসরণ করল তাঁকে।

এক লাইনে খোলা জায়গায় ফিরে এল ওগুলো। আবার ওদেরকে রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে গেল রানা। সিমন সাফারির মাথা লক্ষ করে গুলি করল ও। কিন্তু ল্যাণ্ডরোভারটা ঘণ্টায় ষাট মাইল গতিতে ছুটছে, উঁচু-নিচু মাটির ওপর ঝাঁকি খাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। রানা টেরই পেল না কোথায় লাগল বুলেটগুলো। ঝড় তুলে ছুটে গেল ট্রাকগুলো, সোজা চলে যাচ্ছে মোমু ইউনিট যেখানে কাজ করছে সেদিকে।

ওদিকটা শেষ প্রান্ত। রাস্তার মাথায় মোমুর তৈরি গভীর খাদ। পরিস্থিতি আবার অনুকূল হয়ে উঠেছে। কৃতিত্বটা উহালি ট্র্যাক্টর ড্রাইভারের।

মেহগনি গাছ থেকে ল্যাণ্ডরোভারগুলোকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। স্ট্র্যাপের সঙ্গে রাইফেলটা ঝুলিয়ে নিয়ে গাছ থেকে নেমে এল রানা। রশি বেয়ে এত দ্রুত নামল, তালুতে চামড়া বলে প্রায় কিছু থাকল না। মাটিতে পড়তেই ওর কাছে ছুটে এল লোদজি হাবিব, বাড়িয়ে ধরল একটা একে ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল আর একটা হ্যাভারস্যাক—ওটার ভেতর স্পেয়ার ম্যাগাজিন ও চারটে এমটোয়েনটিসিক্স গ্রেনেড আছে।

'তোমার আপামণি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

বনভূমির দিকে হাত তুলে দেখাল লোদজি হাবিব। দু'জন একসঙ্গে ছুটল সেদিকে।

জঙ্গলে ঢুকে দুশো গজ এগোল ওরা। ডিএইচএফ রেডিও ট্রান্সমিটারের ওপর ঝুঁকে রয়েছে মনিকা। রানাকে দেখে লাফ দিয়ে সিধে হলো সে। 'কি খবর, রানা?' জানতে চাইল সে। 'সিমন···?'

'সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে, মনিকা,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'সিমন সাফারি এখনও ওখানে ছুটোছুটি করছে। ওয়েঙ্গু রেডিও স্টেশন এখনও আমরা দখল করতে পারিনি।'

'ওহ্ গড! এখন কি হবে?' ফ্যাকাসে হয়ে গেল মনিকার চেহারা।

'ট্রান্সমিট!' এক সেকেণ্ড চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিল রানা। 'ড. শেখ ফাহিম ফয়সলকে সবুজ সংকেত দাও। ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, মনিকা। এখন আর পিছু হটার কোন উপায় নেই।'

'কিন্তু সাফারি যদি বেঁচে থাকেন···।'

'তর্ক কোরো না তো!' খেঁকিয়ে উঠল রানা। 'যা বলছি করো। কি করা যায় দেখছি আমি। অন্তত সাফারি এখনও পালিয়ে যেতে পারেননি। এখনও সফল হবার সম্ভাবনা আছে আমাদের। আপাতত তাকে আমরা ওয়েঙ্গুতে কোণঠাসা করে রেখেছি।'

কথা না বাড়িয়ে রেডিও সেটের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল মনিকা, ঠোঁটের সামনে মাইক্রোফোন তুলল। 'গ্রীন বেস, দিস ইজ ক্যাকটাস। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

কাহালিতে সরাসরি পৌঁছুনোর মত রেঞ্জ নেই পোর্টেবল ট্রান্সমিটারটার। গোনডালায় যে সেটটা রয়েছে সেটা যথেষ্ট শক্তিশালী, কাহালিতে মেসেজ পাঠাতে হবে ওটার মাধ্যমে।

'ক্যাকটাস, দিস ইজ গ্রীন বেস,' গোনডালা ক্লিনিক থেকে একজন পুরুষ নার্সের গলা ভেসে এল। লোকটা উহালি গোত্রের, অত্যন্ত বিশ্বস্ত।

'দিস ইজ আ রিলে ফর গোল্ডেন হেড ইন কাহালি। মেসেজ রিডস-দা সান হ্যাজ রাইজেন। আই সে এগেন—দা সান হ্যাজ রাইজেন।'

'স্ট্যাণ্ড বাই, ক্যাকটাস।'

কয়েক মুহূর্তের বিরতি, তারপর আবার রেডিওতে ফিরে এল গোনডালা। 'ক্যাকটাস, গোল্ডেন হেড অ্যাকনলেজস দা সান হ্যাজ রাইজেন।'

পিছু হটার শেষ সুযোগটাও আর থাকল না। এক ঘণ্টার মধ্যে টেলিভিশনে ভাষণ দেবেন ড. ফাহিম ফয়সল। দেশবাসীকে জানাবেন বিপ্লব সংঘঠিত হয়েছে।

কিন্তু সিমন সাফারি এখনও বেঁচে!

'মনিকা, আমার কথা শোনো।' তাকে ধরে নিজের দিকে টেনে আনল রানা, যাতে তার পুরো মনোযোগ পায়। 'এখানে থাকবে তুমি। সারাক্ষণ গোনডালার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। এই জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবে না। সাফারির স্টর্ম ট্রুপাররা চারদিকে ছড়িয়ে আছে। ফিরে এসে আমি যেন ঠিক এখানেই পাই তোমাকে।'

মাথা ঝাঁকাল মনিকা। 'সাবধানে থেকো, ডার্লিং।'

'লোদজি হাবিব,' খুদে বুড়োর দিকে চোখ নামাল রানা। 'এখানে থাকো। খেয়াল রাখো আপামণির দিকে।'

'আমার জান থাকতে আপামণি---।'

'আমাকে একটা চুমো খাও,' আবদার জানাল মনিকা।

'মাত্র একটা। পরে আরও আসছে,' কথা দিল রানা।

মনিকাকে রেখে ইউডিসি বিল্ডিংগুলোর দিকে ছুটল ও।

একশো গজও এগোয়নি, জঙ্গলের ভেতর লোকজনের আওয়াজ পেল। 'শেখ ফাহিম,' চিৎকার করল ও। এটা ওদের পাসওয়ার্ড।

'শেখ ফাহিম,' পাল্টা চিৎকার করল উহালিরা। 'দা সান হ্যাজ রাইজেন!'

'কিন্তু না, এখনও সূর্য ওঠেনি,' বিড়বিড় করল রানা, সামনের দিকে ছুটল।

উহালি কমাণ্ডোর বারো-তেরোজন তরুণকে দেখতে পেল ও। সবার পরনে নীল ডেনিম জ্যাকেট। 'এসো!' সবাইকে নিয়ে সামনে এগোল ও।

খাদের দিকে যাচ্ছে ওরা। রাস্তায় পৌঁছুনোর আগেই দলে উহালিদের সংখ্যা দাঁড়াল ত্রিশ। ইতিমধ্যে থেমে গেছে বৃষ্টি, জঙ্গলের কিনারায় দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। যতদূর দৃষ্টি যায় বিস্তৃত হয়ে আছে ক্ষতবিক্ষত নগ্ন প্রান্তর, মোমু ইউনিটগুলোর কীর্তি। এক সারিতে দৈত্যাকার মেশিনগুলো রয়েছে ওদের সামনে, যেখানে বনভূমি ও লাল মাটি মিলিত হয়েছে। তুফানের মধ্যে পড়া এক ঝাঁক যুদ্ধ-জাহাজের মত লাগল ওগুলোকে।

ওদের আরও কাছাকাছি রয়েছে ল্যাণ্ডরোভারগুলো, কাদাময় প্রান্তরে পরিত্যক্ত ও এলোমেলো ভঙ্গিতে ছড়িয়ে রয়েছে। হিটা গার্ডদের দেখতে পেল রানা, হোঁচট খেতে খেতে কাছাকাছি মোমুর দিকে ছুটছে তারা।

ওদের সামনে রয়েছেন সিমন সাফারি, তাঁর ইউনিফর্ম পরা কাঠামোটা চিনতে পারল রানা। বোঝাই যায়, সবচেয়ে কাছের মোমুটাকে শক্তিশালী প্রতিরোধ ঘাঁটি হিসেবে বাছাই করেছেন তিনি। একটু গম্ভীর হলো রানা, বাছাইটা তাঁর ভাল হয়েছে।

প্রকাণ্ড মেশিনটার ইস্পাতের দেয়ালগুলো রাইফেল বা পিস্তলের গুলি অনায়াসে ঠেকিয়ে দেবে, এমন কি আরপিজি রকেটও ওটার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ওটার কাছে পৌঁছুতে হলে খোলা নরম মাঠ ধরে এগোতে হবে। খোলা মাঠটাকে মোমুর আপার প্ল্যাটফর্ম থেকে কাভার দেয়া যাবে। মাঠের অর্ধেকটাও কেউ পেরুতে পারবে না, উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে গুলি করে ফেলে দেয়া হবে তাকে। মোমুকে ঘাঁটি হিসেবে বেছে নেয়ার গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা সুবিধে হলো, ইস্পাতের ওই দুর্গকে সচল করা যায়। একবার নিয়ন্ত্রণে পেলে, সিমন সাফারি ওটাকে যে-কোন জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন।

দ্রুত নিজের চারদিকে তাকাল রানা। ইতিমধ্যে ওর সঙ্গে পঞ্চাশজনের মত উহালি গেরিলা যোগ দিয়েছে। খুব বেশি হৈ-চৈ করছে তারা, মাত্রা ছাড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। অনেক দূরে হলেও, তাদের মধ্যে অনেকেই সিমন

সাফারি আর গার্ডদের দিকে গুলি ছুঁড়ছে। জানা কথা একটা গুলিও লাগবে না, শুধু শুধু অ্যামুনিশন খরচ করা।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, ওদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা না করাই ভাল। ওদের উত্তেজনা ও উৎসাহ ফুরিয়ে যাবার আগেই আক্রমণে যেতে হবে ওকে। আক্রমণে যেতে হবে মোমুতে পৌঁছে সিমন সাফারি প্রতিরোধ গড়ে তোলার আগেই।

'সামনে বাড়ো, ভায়েরা!' চিৎকার করল রানা। 'শেখ ফাহিম! সূর্য উঠেছে!'

ওদেরকে পথ দেখিয়ে খোলা মাঠে বেরিয়ে এল রানা, হৈ-চৈ করতে করতে ওর পিছু নিল সবাই। 'শেখ ফাহিম!' আবার চিৎকার করল ও, ওদের উত্তেজনা ধরে রাখতে হবে।

সবাই একযোগে চিৎকার করল, 'সূর্য উঠেছে!'

কাদা কোথাও গোড়ালি পর্যন্ত গভীর, কোথাও হাঁটু পর্যন্ত। পরিত্যক্ত ল্যাণ্ডরোভারগুলোকে পাশ কাটাল ওরা। ওদের সামনে সিমন সাফারিকে দেখতে পেল রানা, মোমুর কাছে পৌঁছে গেছেন, পা রাখলেন ইস্পাতের একটা মই-এর ধাপে। নরম কাদায় ডেবে যাচ্ছে পা, এগোবার গতি কমে গেল ওদের।

মোমুতে উঠে পড়ল হিটা গার্ডরা, তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করে নির্দেশ দিচ্ছেন সিমন সাফারি। প্রকাণ্ড মেশিনটার ভেতর ইস্পাতের আড়ালে পজিশন নিচ্ছে তারা। মোমু থেকে ছুটে এল ঝাঁক ঝাঁক বুলেট, উহালিদের মাথার ওপর দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে, গেঁথে যাচ্ছে কাদার ভেতর। রানার পাশে একজন তরুণ ঝাঁকি খেল। কাদায় মুখ দিয়ে পড়ল সে।

আক্রমণ গতি হারাল, ডেবে যাচ্ছে কাদার ভেতর। স্টীল বাঙ্কহেড-এর পিছনে দাঁড়িয়ে নিরাপদ বোধ করছে হিটা গার্ডরা, প্রতিটি গুলি করার আগে লক্ষ্যস্থির করার সময় সুযোগ পাচ্ছে। আরও বেশি সংখ্যায় গুলি খাচ্ছে রানার লোকজন।

তারপর থেমে গেল আক্রমণ। উহালিদের কেউ কেউ ঘুরে দাঁড়াল, ফেলে আসা পথ ধরে ছুটল জঙ্গলের দিকে। কেউ কেউ পরিত্যক্ত ল্যাণ্ডরোভারগুলোর পিছনে আশ্রয় নিল। রাগ হলেও, রানা বুঝল ওদেরকে দোষ দেয়া যায় না। ওদের মধ্যে একজনও সৈনিক নয়। কেরানী, ট্রাক ড্রাইভার আর কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র। দুর্ভেদ্য ইস্পাতের দুর্গ থেকে ক্র্যাক প্যারট্রুপাররা গুলি করলে পালাবে না তো কি করবে। না, ওদেরকে দোষ দেয়া যায় না, যদিও ওরা পালাতে শুরু করায় কাদার ভেতর ডুবে মারা যাচ্ছে এত সাধের বিপ্লব।

রানা একা যায় কি করে! এরইমধ্যে হিটাদের বিশেষ নজর পড়েছে ওর ওপর, তাদের বেশিরভাগ গুলিই ছুটে আসছে ওর দিকে। পিছু হটতে বাধ্য হলো রানা, কাছাকাছি ল্যাণ্ডরোভারটার পিছনে আশ্রয় নিল।

চেসিসের পিছন থেকে রানা দেখল, মোমুর ক্রুরা স্টেশন ছেড়ে নেমে এসেছে, নিচের প্ল্যাটফর্মে অসহায়, জড়োসড়ো ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে তারা। একজন হিটা অফিসারকে দেখা গেল, হাত নেড়ে কি যেন বলছে তাদেরকে। একটু পরই দেখা গেল ক্রুরা মই বেয়ে নামতে শুরু করল। বোঝা গেল, মোমু

ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদেরকে।

মোমুর এঞ্জিন এখনও চলছে। একসকেইভেটরগুলো এখনও মাটি চিবাচ্ছে, তবে প্রকাণ্ড রিগটা নির্দিষ্ট কোন দিকে পরিচালিত না হওয়ায় অন্যান্য মোমুর সঙ্গে তৈরি লাইন ভেঙে বেরিয়ে আসছে। অন্যান্য মোমুর ক্রুরা দেখল কি ঘটছে, ফলে তারাও যে যার স্টেশন ছেড়ে নেমে এল কাদায়, গুলি লাগার ভয়ে মাথা নিচু করে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে যে যেদিকে পারে ছুটল।

একেই বলে অচল অবস্থা। সিমন সাফারি তাঁর লোকজনদের নিয়ে মোমু দখল করে ফেলেছেন, এক অর্থে তিনি কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন; আর রানার কমাণ্ডোরা আটকা পড়েছে কাদায়, না পারছে সামনে বাড়তে না পারছে পিছু হটতে।

অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার জন্যে কি করা যায় ভাবছে রানা। উহালি গেরিলাদের আবার জড়ো করে আক্রমণে যাওয়া এখন আর সম্ভব বলে মনে হয় না। আক্রমণে কাজও বোধহয় হবে না। মোমুতে সিমন সাফারির লোক রয়েছে পনেরো থেকে বিশজন, কাদাভরা মাঠ পেরিয়ে মোমুর কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই উহালি গেরিলাদের শুইয়ে দেবে তারা।

মোমু থেকে গুলি করছে হিটা গার্ডরা, এদিক থেকে উহালিরাও। গোলাগুলির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল অন্য একটা আওয়াজ। প্রথমে অস্পষ্ট একটা গুঞ্জনের মত লাগল রানার কানে। তারপর মনে হলো, অশান্ত কোন আত্মার করুণ বিলাপ। নাকি সী গাল ডাকছে? পিছন দিকে তাকাল রানা। প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। তারপর কি যেন নড়ে উঠল জঙ্গলের কিনারায়। দেখল, কিন্তু চিনতে পারল না। তা কি করে সম্ভব, মানুষ হয় কি করে?

তারপর আরও নড়াচড়া লক্ষ করল রানা। জেগে উঠছে বনভূমি। হাজার হাজার অদ্ভুত প্রাণী, পোকামাকড়ের মতই অসংখ্য, যেন মিছিল করে এগিয়ে আসছে পিঁপড়েদের বিশাল একটা কলোনি। কাদা মেখে লাল হয়ে আছে তারা। তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে আসছে গলা থেকে। সবাই মিলে যেন হাহাকার করছে। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে সেই হাহাকার, তারপর আওয়াজটা বদলে যেতে শুরু করল—গর্জে উঠল তারা, আক্রোশে হুংকার ছাড়ল। বনভূমি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা জলোচ্ছ্বাসের মত।

হঠাৎ উপলব্ধি করল রানা কি দেখতে পাচ্ছে। লেবার ক্যাম্পের গেটগুলো খুলে দেয়া হয়েছে। গার্ডদের কাবু করা হয়েছে, কাদা থেকে উঠে এসেছে উহালি ক্রীতদাসরা। কবর থেকে উঠে আসা লাশ যেন ওরা, উলঙ্গ শরীরে লাল কাদা লেপ্টে আছে। কতদিন খেতে পায়নি, কংকাল বললেই হয়।

পড়িমরি করে, হুড়মুড় করে সামনে বাড়ল তারা, হাজারে হাজারে। কে মেয়ে কে পুরুষ চেনার উপায় নেই, কাদায় ঢাকা পড়ে গেছে তাদের বৈশিষ্ট্য। শুধু শিশুদের চেনা গেল। 'শেখ ফাহিম!' আওয়াজ তুলল তারা, যেন পাথুরে তীরে লেগে বিস্ফারিত হলো সমুদ্রের একটা ঢেউ।

হিটা প্যারাট্রুপাররা গুলি করছে এখনও, গুলির শব্দ চাপা পড়ে গেল তাদের হুংকার আর গর্জনে। উন্মত্ত ক্রীতদাসরা গায়ে গা ঠেকিয়ে এগোচ্ছে, একে

ফরটিসেভেনের বুলেট তাদের মধ্যে এতটুকু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। যেখানে একজন লোক ধরাশায়ী হলো, পলকের মধ্যে সে-জায়গা দখল করল পাঁচজন লোক। মোমু দুর্গে হিটা গার্ডদের অ্যামুনিশনে টান পড়ল। এত দূর থেকেও তাদের আতংক অনুভব করতে পারল রানা। কয়েকজন হিটাকে হাতের রাইফেল ছুঁড়ে ফেলে দিতে দেখল ও।

এখন তারা নিরস্ত্র, ইস্পাতের মই বেয়ে হলুদ দৈত্যটার ওপরের প্লাটফর্মে উঠে যাচ্ছে। ওখানে পৌঁছে রেইলিং-এর সামনে দাঁড়াল তারা, দেখল নগ্ন ও লাল ভিড়টা মোমুর গোড়ায় থামল, তারপর উঠতে শুরু করল ওপর দিকে। একটা মইও খালি থাকল না, প্রতিটিতে কিলবিল করছে ওরা।

আপার ডেকে হিটাদের সঙ্গে সিমন সাফারি রয়েছেন, তাকে চিনতে পারল রানা। সদ্য মুক্ত উহালি শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছেন তিনি। উদার ভঙ্গিতে হাত দুটো দু'দিকে মেলে দিয়ে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছেন তাদেরকে। সম্ভবত যুক্তি ও শান্তির পথে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন তিনি। সবশেষে, শ্রমিকদের প্রথম সারিটা যখন রেইলিং-এর কাছে পৌঁছে গেল, পিস্তল বের করে ওদের দিকে গুলি করলেন। নিজেদের শরীর দিয়ে তারা তাকে ঢেকে ফেলল, তখনও তিনি গুলি করছেন।

নগ্ন মানবসন্তানদের ভিড়ে মুহূর্তের জন্যে সিমন সাফারিকে হারিয়ে ফেলল রানা। পোকার মতই কিলবিল করছে তারা হিটা সামরিক প্রশাসকের ওপর। তারপর আবার সিমন সাফারিকে দেখতে পেল ও। কয়েকশো হাত মাথার ওপর তুলে নিল তাঁকে। আরও কয়েকশো টেনে নিল তাঁকে। রেইলিং-এর দিকে নিয়ে আসছে।

তারপর তারা তাঁকে মোমুর ওপর থেকে ফেলে দিল নিচে।

শূন্যে ডিগবাজি খেলেন সিমন সাফারি। ভঙ্গিটা আড়ষ্ট, যেন ডানা ভাঙা একটা পাখি ওড়ার চেষ্টা করছে। সত্তর ফুট নিচে পড়লেন তিনি, একসকেইভেটর হেড-এর ঘুরন্ত রূপালি ব্লেডের ওপর। ব্লেডগুলো স্যাঁৎ করে টেনে নিল তাঁকে, এবং মাত্র এক পলকের ভেতর চিবিয়ে এমন নিখুঁত ও মোলায়েম মণ্ড বানিয়ে ফেলল যে তাঁর রক্ত ভিজে মাটিতে সামান্য একটু দাগও ফেলল না।

ধীরে ধীরে দাঁড়াল রানা।

মোমুর ওপর হিটা প্যারাট্রুপারদের খুন করছে উহালি শ্রমিকরা, খালি হাতে একটা করে ধরছে, তারপর আক্ষরিক অর্থেই ছিঁড়ে ও ফেড়ে ফেলছে। তাদের হুঙ্কার ও উল্লাসধ্বনি পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। ওদিকে এগোল ও, তারপর কি মনে করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাবল, ওর বরং মনিকার কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। মোমুতে ওরা যা করছে করুক, বাধা দিয়ে লাভ হবে না।

ঘুরল রানা, ফিরে যাচ্ছে মনিকার কাছে।

এগারো

ফিরে আসতে সময় লাগছে রানার। কমাণ্ডোর সদস্যরা ঘিরে ধরেছে ওকে, প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে কে কার আগে ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবে। ওর পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে তারা, গান গাইছে, বিজয়ের আনন্দে হাসছে।

জঙ্গলের ভেতর থেকে এখনও দু'একটা গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। আগুন ধরে গেছে প্রশাসনিক ভবনে। আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেছে আগুনের শিখা, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে কালো ধোঁয়া। একটা ছাদ ধসে পড়ল। ওখানে আটকা পড়েছে লোকজন, পুড়ে মারা যাচ্ছে। উহালি শ্রমিকরা ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে–হিটা গার্ডদের ধাওয়া করছে তারা, ধাওয়া করছে কেরানি, অফিসার, এঞ্জিনিয়ারদেরও। কালো হোক আর হলদেটে তাইওয়ানিজ, কোম্পানীর সঙ্গে জড়িত একটা লোককেও রেহাই দিচ্ছে না। ধরতে পারলেই হয়, কিল-ঘুসি-লাথি মেরে শুইয়ে ফেলছে মাটিতে। তারপর শাবল, কোদাল বা ম্যাচেটি দিয়ে আঘাত করছে, টুকরো টুকরো করছে শরীরগুলোকে। সবশেষে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে আগুনে। বীভৎস একটা দৃশ্য। এরই নাম আফ্রিকা।

ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল রানা। ওর একার পক্ষে ওদেরকে থামানো সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন অত্যাচারিত হয়েছে ওরা, ওদের ঘৃণা ও আক্রোশ সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। জঙ্গলে ঢুকে পড়ল রানা, মনিকার কাছে যাচ্ছে।

একশো গজও এগোয়নি, দেখল গাছপালার ভেতর দিয়ে ছোট্ট একটা মূর্তি ছুটে আসছে ওর দিকে।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'লোদজি হাবিব!' ডাকল ও।

ছুটে এসে রানার একটা হাত আঁকড়ে ধরল বুড়ো পিগমি। 'আপামণি!' হাঁপাচ্ছে সে, গলার আওয়াজ কর্কশ। রানা দেখল, লোদজি হাবিবের খুলির চামড়া উঠে গেছে, রক্ত ঝরছে কানের পাশ ঘেঁষে।

'কোথায় মনিকা? কি হয়েছে ওর?' লোদজি হাবিবকে ধরে ঝাঁকাল রানা। 'বলো।'

'আপামণি…আপামণি নেই! আপামণিকে ধরে নিয়ে গেছে সে। জঙ্গলে…।'

মাটিতে হাঁটু গেড়ে রেডিও সেটের ওপর ঝুঁকে রয়েছে মনিকা, নব ঘুরিয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে গোনডালার সঙ্গে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর হতাশ হয়ে পড়ল সে, তারপর ভাবল দেখা যাক রেডিও উবোমো ধরা যায় কিনা। রাজধানী কাহালি পর্যন্ত রেঞ্জ নয় ট্রান্সমিটারটার, তবে লোদজি হাবিব সিল্ক-কটন ট্রির মগডালে পৌঁছে দিয়েছে এরিয়ালের তার। পঁচিশ মিটার ব্যাণ্ডে রেডিও উবোমো ধরা গেল, যান্ত্রিক শব্দটা তেমন বিঘ্ন সৃষ্টি করছে না।

পরবর্তী অনুরোধ করা হয়েছে মরিয়ম বুবকি তোমার নামে। অনুরোধ করেছে তোমার বয়ফ্রেণ্ড রহিম বাদশা। আজ তোমার সতেরো বছর পুরো হলো। তোমার এই শুভ জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছে রহিম বাদশা। বলেছে, সে তোমাকে অন্তর থেকে ভালবাসে। তার অনুরোধ ম্যাডোনার এই গানটা, লাইক আ ভার্জিন। শোনো তাহলে, মরিয়ম বুবকি…।'

গানটা শুরু হতে আওয়াজ কমিয়ে দিল মনিকা, সঙ্গে সঙ্গে আবার তার কানে ফিরে এল গোলাগুলির আওয়াজ ও মানুষজনের চিৎকার।

ওদিকে মরণপণ যুদ্ধ হচ্ছে। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় অসুস্থবোধ করল মনিকা। রানা তাকে এই জায়গা ছেড়ে নড়তে নিষেধ করে গেছে। যুদ্ধটা কোন দিকে মোড় নিচ্ছে জানার কোন উপায় নেই তার। নিজেকে অসহায় লাগছে, ভয়ও লাগছে। কিছু একটা ঘটবে, তার জন্যে অপেক্ষা করতে ভাল লাগছে না।

হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল গানটা। কিছুক্ষণ যান্ত্রিক শব্দজট শোনা গেল শুধু। তারপর অকস্মাৎ নতুন একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'উবোমোর জনগণ। এই রেডিও স্টেশন এখন ফ্রিডম আর্মি অব উবোমোর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। উবোমোর মহামান্য প্রেসিডেন্টকে এখন আপনাদের সামনে হাজির করছি আমরা। ড. শেখ ফাহিম ফয়সল স্বয়ং এখন কাহালি রেডিও স্টেশন থেকে আপনাদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।'

এরপর শুরু হলো জাতীয় সঙ্গীত। ক্ষমতা দখলের পর এই জাতীয় সঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন সিমন সাফারি।

জাতীয় সঙ্গীত শেষ হলো। তারপর কিছুক্ষণ বিরতি।

অবশেষে মনিকার প্রিয় ও রোমাঞ্চকর একটা ভারি কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'প্রিয় দেশবাসী, আসসালামোআলায়কুম। আমি শেখ ফাহিম ফয়সল বলছি। অত্যাচারী আপনাদের ওপর যে জুলুম চালিয়েছে সে-ব্যাপারে আমি সচেতন ও ব্যথিত। আমি জানি, আপনারা প্রায় সবাই জানেন যে আমি মারা গেছি। কিন্তু না, আমার এই কণ্ঠস্বর কবর থেকে আসছে না। আমি ড. শেখ ফাহিম ফয়সল, স্বয়ং কথা বলছি আপনাদের সামনে।' ভাষণ দিচ্ছেন তিনি সোয়াহিলি ভাষায়। 'আমি আপনাদের জন্যে বিজয়ের আনন্দ ও আশার বাণী নিয়ে এসেছি। সিমন সাফারি, অত্যাচারী স্বৈরশাসক, মারা গেছেন। দেশপ্রেমিক ও বিশ্বস্ত একদল সচেতন নাগরিক নিষ্ঠুর অত্যাচারীকে উৎখাত করেছেন, তাঁকে দিয়েছেন উচিত ও প্রাপ্য শাস্তি। আপনারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসুন, প্রিয় দেশবাসী–আমার এই উদাত্ত আহ্বান সর্বস্তরের উবোমোবাসীর জন্যে। আপনারা জাগুন, কারণ উবোমোর আকাশে নতুন সূর্য উঠেছে…।'

ড. ফয়সলের কণ্ঠস্বরে এত আন্তরিকতা, মনিকার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল সিমন সাফারি সত্যি মারা গেছেন। তারপর আবার গুলির শব্দ ঢুকল তার কানে, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে।

তার কাছাকাছি একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোন শব্দ না করে তার ঠিক পিছনে চলে এসেছে লোকটা। দেখে বোঝা যায় এশিয়ান, সম্ভবত চীনা। নীল

সাফারি পরে রয়েছে, বৃষ্টি আর ঘামে ভিজে গেছে সেটা, এখানে-সেখানে কাদার দাগ লেগে রয়েছে। তার লম্বা কালো চুল ঝুলে আছে কপাল থেকে। মুখে একটা অগভীর কাটা দাগ দেখা যাচ্ছে, ওটা থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়েছে জ্যাকেটের সামনে।

তার এক হাতে একটা পিস্তল, চোখে হিংস্র ও উদভ্রান্ত দৃষ্টি। মুখের চেহারা বিকৃত হয়ে আছে রাগ ও আতংকে। পিস্তল ধরা হাতটা ঝাঁকি খাচ্ছে আর কাঁপছে।

আগে কখনও না দেখলেও লোকটাকে চিনতে পারল মনিকা। লোকটার কথা রানাকে অনেকবার বলতে শুনেছে সে। দৈনিক উবোমো হেরাল্ড-এ তার ছবিও দেখেছে, পত্রিকাটা মাঝে মধ্যে গোনডালায় পৌঁছায়। মনিকা জানে, লোকটা ইউডি সি-র তাইওয়ানিজ ম্যানেজিং-ডিরেক্টর। এই লোকই রানার বন্ধু আলি শাহকে খুন করেছে, খুন করেছে তার গোটা পরিবারকে।

'গড,' বিড়বিড় করল মনিকা, ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে পিছু হটার চেষ্টা করল। কিন্তু এক লাফে এগিয়ে এসে তার একটা হাত ধরে ফেললেন চঙমঙ গঙ।

ভদ্রলোকের হাতে অসম্ভব শক্তি, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল মনিকা। মনিকার হাতটা মুচড়ে ধরলেন চঙমঙ গঙ, বাঁকা করে তার পিঠের দিকে নিয়ে এলেন।

'সাদা মেয়ে,' হিসহিস করে বললেন তিনি। 'জিম্মি হিসেবে ভাল···।'

আশপাশেই ছিল লোদজি হাবিব, মনিকার সাহায্যে ছুটে এল। হাতের পিস্তলটা সবেগে ঘোরালেন চঙমঙ গঙ, খুলিতে লেগে কেটে দিল বুড়োর চামড়া। তাঁর পায়ের সামনে পড়ে গেল লোদজি হাবিব। এক হাতে মনিকাকে ধরে রেখে অপর হাতের পিস্তলটা তার খুলির দিকে তাক করলেন চঙমঙ গঙ।

'না!' আঁতকে উঠল মনিকা, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা দিল চঙমঙ গঙের বুকে। ব্যর্থ হলো লক্ষ্য, লোদজি হাবিবের মুখ থেকে ছ'ইঞ্চি দূরে মাটিতে গাঁথল বুলেট। গুলির শব্দে জ্ঞান ফিরল বুড়োর, একটা গড়ান দিয়ে দূরে সরে গেল সে, লাফ দিয়ে ছুটল। তাকে লক্ষ্য করে আরেকটা গুলি করলেন চঙমঙ গঙ, তবে লাগল না, জঙ্গলের ভেতর হারিয়ে গেল বুড়ো।

মনিকার হাতটা সজোরে মোচড়ালেন তিনি, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে। 'ছাড়ুন, ব্যথা লাগছে!'

'শুধু ব্যথা দেব না, ফের যদি ধস্তাধস্তি করো একেবারে মেরে ফেলব,' হুমকি দিলেন চঙমঙ গঙ। 'হ্যাঁ, এই তো লক্ষ্মী মেয়ে! আর যদি ব্যথা পেতে না চাও, শান্তভাবে হাঁটো।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল মনিকা, চেষ্টা করল ব্যথা ভুলে শান্ত থাকার। 'জঙ্গলে ঢুকে কোন লাভ নেই। এই জঙ্গলে পালাবার কোন পথ নেই।'

'তুমি সঙ্গে থাকলে আছে,' বললেন চঙমঙ গঙ। 'আর কোন কথা নয়। একদম চুপ! হাঁটতে থাকো।'

টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি, বাধা দেয়ার সাহস পাচ্ছে না মনিকা। সে বুঝতে পারছে, একেবারে মরিয়া হয়ে আছেন ভদ্রলোক, তাঁর দ্বারা যে-কোন কাজ সম্ভব। একটু আগেই দেখেছে, খুন করার জন্যে গুলি করেছেন লোদজি হাবিবকে।

তাঁর সম্পর্কে রানা কি বলেছে, মনে পড়ে গেল। জিম্বাবুইয়ে ম্যাটাবেল আলী শাহ আর তার পরিবারকে খুন করেছেন। তাঁর সম্পর্কে গুজব আছে, বাচ্চা ছেলে ও ছোট মেয়েদের ওপর বিকৃত যৌনলালসা চরিতার্থ করেন। মনিকা বুঝতে পারল, আপাতত বেঁচে থাকার একটাই সুযোগ আছে তার, চঙমঙ গঙের প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলতে হবে তাকে।

আধ মাইল হাঁটল ওরা। হাঁটার গতি মন্থর, ঝোপ-ঝাড় এড়িয়ে এগোতে হচ্ছে, টানতে হচ্ছে মনিকাকে। সরু একটা জলস্রোতের কিনারায় পৌঁছুল ওরা। দেখেই নদীটাকে চিনতে পারল মনিকা। ওয়েঙ্গু, এই নদীর নামেই এলাকার নাম রাখা হয়েছে। মূল উবোমো নদীর একটা শাখা ওয়েঙ্গু।

ওয়েঙ্গুর পানিও লাল, মোমু ভেহিকেলের বর্জ্য দূষিত ও ভরাট করে ফেলেছে। একটা গন্ধ পেল মনিকা, পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল তার। পানি খুব কম, থকথক করছে লাল কাদা। এমনকি চঙমঙ গঙও বুঝতে পারলেন, নদীটা বিপজ্জনক। পার হতে গেলে বিপদ ঘটতে পারে।

জোর করে মনিকাকে মাটিতে হাঁটু গাড়তে বাধ্য করলেন তিনি, তার পিঠে একটা পা দিয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। হাঁপাচ্ছেন, চেহারায় অনিশ্চিত ভাব।

'প্লীজ···,' ফিসফিস করল মনিকা।

'চোপ!' গর্জে উঠল চঙমঙ গঙ। 'তোমাকে না আমি কথা বলতে নিষেধ করেছি!' পিঠে তুলে আনা হাতটা আরও খানিক মুচড়ে ধরলেন তিনি, ব্যথায় ফুঁপিয়ে উঠল মনিকা।

আরও কয়েক মুহূর্ত পর হঠাৎ তিনি জানতে চাইলেন, 'এটা কি ওয়েঙ্গু নদী? কোন দিকে গেছে এটা? দক্ষিণে, মেইন রোডের দিকে গেছে কি?'

তাঁর চিন্তাধারা আন্দাজ করতে পারল মনিকা। গোটা এলাকা সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকার কথা তাঁর। এটা তো তাঁরই কনসেশন। নিশ্চয়ই এলাকার ম্যাপটাও তাঁর দেখা আছে। জানেন, ওয়েঙ্গু ধনুকের মত বাঁকা হয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে, চলে গেছে মেইন রোডের দিকে। আরও জানেন, ব্রিজে একটা হিটা মিলিটারি পোস্ট আছে।

'এটা কি ওয়েঙ্গু?' আবার প্রশ্ন করলেন চঙমঙ গঙ, মনিকার হাতটা মোচড়াতে শুরু করলেন।

ব্যথায় কেঁদে ফেলল মনিকা। তবু সত্যি কথা বলল না। 'আমি জানি না।' মাথা নাড়ল সে। 'এই জঙ্গল সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি!'

'মিথ্যে বলছ,' অভিযোগ করলেন চঙমঙ গঙ, তবে অভিযোগটা তেমন জোরাল নয়। তারপর তিনি জানতে চাইলেন, 'তুমি কে? এখানে কি করছিলে?'

'সামান্য একজন নার্স, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনে আছি। জঙ্গল সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই।'

'ঠিক আছে,' টান দিয়ে মনিকাকে দাঁড় করালেন চঙমঙ গঙ। 'চলো।'

মনিকাকে ধাক্কা দিয়ে সামনে রাখলেন তিনি। এবার ওরা ওয়েঙ্গুর কিনারা ধরে দক্ষিণ দিকে হাঁটছে।

হাঁটার সময় ইচ্ছে করে মাটিতে পা ঘষছে মনিকা, দাগ রেখে যাচ্ছে।

লোদজি হাবিব তার খোঁজে ফিরে আসবে, জানে সে। ওদেরকে অনুসরণ করার কাজটা সহজ করে দিচ্ছে সে। জানে, লোদজি হাবিবের সঙ্গে রানাও আসবে।

ঝোপের ভেতর বাঁ পাশ দিয়ে যাবার সময় সরু ডালগুলো সুযোগ পেলেই ভাঙল মনিকা। শার্টের একটা বোতাম ছিঁড়ে ফেলে দিল ঝোপের পাশে, দেখেই চিনতে পারবে লোদজি হাবিব। যখনই সুযোগ এল, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মনিকা। যতটা সম্ভব দেরি করিয়ে দিচ্ছে চঙমঙ গঙকে, কমিয়ে রাখছে দূরত্ব।

তারপর কান্না জুড়ে দিল মনিকা। ফোঁপাতে শুরু করল। রেগে গিয়ে তার দিকে পিস্তল তুললেন চঙমঙ গঙ। চিৎকার শুরু করল মনিকা, 'না, প্লীজ! প্লীজ, আমাকে মারবেন না!'

মনিকা জানে, তার চিৎকার অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। লোদজি হাবিবের কান খুব খাড়া, তার গলা ঠিকই চিনতে পারবে সে। আওয়াজ শুনেই ধরতে পারবে ঠিক কোথায় আছে সে।

শুকনো পাতার ওপর থেকে বোতামটা তুলে রানাকে দেখাল লোদজি হাবিব। 'দেখুন, বাপজান, আপামণি আমাদের জন্যে চিহ্ন রেখে গেছেন। এটা আপামণির শার্টের বোতাম, আমি চিনি। আমার আপামণি শেয়ালের মত চালাক আর বুনো মোষের মত সাহসী।'

'হাঁটতে থাকো,' ধমক দিল রানা। 'পরে ভাষণ দেয়ার অনেক সময় পাবে।'

ছাপ ধরে নিঃশব্দে এগোল ওরা। প্রতি মুহূর্তে সতর্ক হয়ে আছে। কথা না বলে আঙুল খাড়া করে মনিকার রেখে যাওয়া চিহ্নগুলো রানাকে দেখাচ্ছে লোদজি হাবিব—ঝোপের ভাঙা ডাল, মাটিতে পায়ের আঁচড়, এক জায়গায় হাতের ছাপ দেখা গেল, ওখানটায় ইচ্ছে করে আছাড় খেয়েছিল সে।

'আর বেশি দূরে নয়,' হঠাৎ ফিসফিস করল লোদজি হাবিব, রানার বাহু আঁকড়ে ধরল। 'খুব কাছে···।'

'সাবধান, হুট করে তার সামনে গিয়ে পড়ো না। হয়তো ওত পেতে কোথাও বসে আছে আমাদের অপেক্ষায়···।'

ওদের সামনে থেকে মনিকার আর্তচিৎকার ভেসে এল, 'না, প্লীজ! প্লীজ, আমাকে মারবেন না।'

মুহূর্তের জন্যে নিজের ওপর রানার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকল না। ছুটল ও, মনিকাকে উদ্ধার করতে হবে। খপ করে ওর কব্জি ধরে ঝুলে পড়ল খুদে পিগমি।

'না! না!' ব্যাকুল কণ্ঠে ফিসফিস করল সে। 'আপামণি আহত হয়নি! আপামণি আমাদেরকে সাবধান করছে। বিদেশী বোকাদের মত তাড়াহুড়ো করবেন না। মাথাটা খাটান, বাপজান।'

নিজেকে সামলে নিল রানা, তবে রাগে কাঁপছে ও।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে লোদজি হাবিব, চোখে প্রত্যাশা।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'চঙমঙ গঙ তোমাকে দেখেছেন, তবে জানেন না

যে আমিও এখানে আছি। ঘুরপথে ওদেরকে ছাড়িয়ে সামনে চলে যাচ্ছি আমি, অপেক্ষা করব ভাটির দিকে। তুমি ওদেরকে খেদিয়ে আমার কাছে নিয়ে যাবে। ঠিক যেমন হরিণগুলোকে খেদিয়ে জালের কাছে নিয়ে যাও। কি, পারবে তো, লোদজি হাবিব?'

পারব না মানে! বাপজান তোতাপাখির ডাক ছাড়বেন, তাহলেই আমি বুঝে নেব আপনি তৈরি হয়ে আছেন।

একে ফরটিসেভেনের মাজল থেকে ভাঁজ করা বেয়োনেটটা খুলে নিল রানা। রাইফেলটা ঝুলিয়ে রাখল একটা গাছের ডালে। চঙমঙ গঙ মনিকাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছেন, রাইফেল এখন কোন কাজে আসবে না। ফেলে যাওয়াই ভাল।

হাতে শুধু বেয়োনেট, নদীর কাছ থেকে সরে ঘুরপথ ধরে দ্রুত এগোল রানা। আরও দু'বার মনিকার চিৎকার শুনল ও, করুণ সুরে আবেদন জানাচ্ছে। তার গলাই ওকে জানিয়ে দিল ঠিক কোথায় রয়েছে ওরা।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মনিকা ও চঙমঙ গঙের সামনে চলে এল রানা। নদীর কিনারা থেকে একটা গাছ উঠেছে, সেটার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। মুখের সামনে হাত তুলে ডাক ছাড়ল তোতাপাখির। বেয়োনেটটা বাগিয়ে ধরে অপেক্ষা করছে।

বনভূমির ভেতর লোদজি হাবিবের তীক্ষ্ণ-কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তার গলায় ভেনট্রিলোকুইস্ট-এর সুর, শ্রোতা বুঝতে পারবে না আওয়াজটা কোত্থেকে বা কত দূর থেকে আসছে। 'ওহে, বিদেশী নাক চ্যাপ্টা। আমার আপামণিকে ছেড়ে দাও। গাছের মাথা থেকে তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি। আপামণিকে ছেড়ে দাও, তা না হলে বিষাক্ত তীর ছুঁড়ব আমি।'

সোয়াহিলি ভাষা চঙমঙ গঙ বুঝতে পারবেন কিনা সন্দেহ হলো রানার। তবে লোদজি হাবিবের উদ্দেশ্য ঠিকই পূরণ হবে। চঙমঙ গঙের খেয়াল ও মনোযোগ থাকবে উজানের দিকে, নিজের অজান্তে ধীরে ধীরে ভাটি অর্থাৎ রানার দিকে এগিয়ে আসবেন তিনি।

গাছটার আড়ালে ওত পেতে থাকল ও। খানিক পর আবার শুনতে পেল লোদজি হাবিবের গলা। 'ওহে, বিদেশী, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি?'

আবার নিস্তব্ধতা নামল। চোখ আর কান আরও সজাগ করল রানা।

তারপর খস খস আওয়াজ হলো একটা ডাল থেকে। আওয়াজটা এল ঠিক ওর সামনে থেকে। মনিকার গলা শুনতে পেল ও। 'প্লীজ, না···,' শুরু করল সে, কিন্তু চঙমঙ গঙ তাকে থামিয়ে দিলেন।

ফিসফিস করে বললেন, 'চোপ! কথা বললে হাত ভেঙে দেব।'

খুব কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। বেয়োনেটের হাতলটা আরও শক্ত করে ধরল রানা। এই সময় একটা ঝোপ নড়ে উঠল। এক মুহূর্ত পর চঙমঙ গঙের নীল জ্যাকেটটা দেখা গেল।

পিছু হটছেন চঙমঙ গঙ, মনিকাকে ধরে আছেন বুকের ওপর, মুখ তুলে তাকিয়ে আছেন যেদিক থেকে লোদজি হাবিবের গলা ভেসে আসছে। তার হাতে

ধরা পিস্তলটা মনিকার কাঁধের ওপর, লোদজি হাবিবকে দেখামাত্র গুলি করবেন। পিছু হটে সরাসরি রানার দিকে চলে আসছেন তিনি।

রানা জানে, মার্শাল আর্ট-এ অত্যন্ত দক্ষ চঙমঙ গঙ। খালি হাতে লড়াই করতে হলে বিপদেই পড়বে ও। মার্শাল আর্ট-এ রানাও কম যায় না, তবে চঙমঙ গঙের সঙ্গে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। কে জিতবে বলা কঠিন। সহজ উপায় একটাই আছে। সহজ ও নিরাপদ। পিছন থেকে চঙমঙ গঙের কিডনিতে বেয়োনেট ঢুকিয়ে দেয়া। মুহূর্তের মধ্যে অচল হয়ে পড়বেন তিনি।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা, বেয়োনেটটা নিচু করে ধরে আছে। স্যাঁৎ করে এগোল ও, আঘাত করল বেয়োনেট দিয়ে। কিভাবে তিনি সতর্ক হলেন, রানা বলতে পারবে না, কারণ ও কোন শব্দ করেনি। বলা হয় কুংফু ফাইটাররা প্রায় সুপারন্যাচারাল ইন্সটিংক্ট-এর অধিকারী হয়, এ বোধহয় তাই হবে।

বেয়োনেটটা চঙমঙ গঙের পাশে লাগল, হিপ বোন-এর এক ইঞ্চি ওপরে। ফলাটা ঢুকে গেল হাতলের কিনারা পর্যন্ত, তবে চঙমঙ গঙ ঘুরে যাওয়ায় রানার হাত থেকে ছুটে গেল ওটা।

মনিকাকে ছেড়ে দিলেন চঙমঙ গঙ, তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন, পিস্তলটা ঘুরিয়ে রানার দিকে আনলেন ওর মুখে গুলি করার জন্যে। খপ করে পিস্তল ধরা হাতটা ধরে ওপর দিকে তুলে দিল রানা। প্রথম গুলিটা ওদের মাথার ওপর ডালপালায় লাগল।

রানার হাতে ধরা পড়ে মোচড় খেলেন চঙমঙ গঙ, একটা ভাঁজ করা হাঁটু তুলে আঘাত করতে চাইলেন ওর উরুসন্ধিতে। একটু বাঁকা হয়ে আঘাতটা উরুতে লাগতে দিল রানা, তবে এত জোরে লাগল যে গোটা পা যেন অবশ হয়ে গেল।

চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল, কুড়ালের পাতের মত শক্ত হয়ে উঠেছে চঙমঙ গঙের বাম হাত, ছুটে আসছে ওর মাথার দিকে, আঘাত করবে ওর ঘাড় ও কানের নিচে। কাঁধ নিচু করল রানা, বাহুর ওপর দিকে গ্রহণ করল আঘাতটা। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল ও, ঘুরে উঠল মাথা। চঙমঙ গঙের পিস্তল ধরা হাতটা ওর মুঠোর ভেতর ঢিল হয়ে গেল।

বাম হাত দিয়ে আবার রানাকে আঘাত করলেন চঙমঙ গঙ, রানা বুঝতে পারল এবার ওর ঘাড় শুকনো ডালের মত ভেঙে যাবে।

পিঠে চঙমঙ গঙের ধাক্কা খেয়েও ছিটকে পড়েনি মনিকা। নিজেকে সামলে নিয়ে ছুটে এল সে শত্রুর দিকে, তাঁর পাঁজরে ধাক্কা মারল কাঁধ দিয়ে, যেদিকটা চিরে ফাঁক করে দিয়েছে বেয়োনেট। চঙমঙ গঙ ধাক্কা খেলেন, রানার উন্মুক্ত ঘাড়ে আঘাতটা লাগল না।

রানার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তিনি। ব্যথায় চিৎকার করে উঠে হাতের পিস্তলটা ছেড়ে দিলেন।

মরিয়া হয়ে খালি হাতটা চঙমঙ গঙের মাথার পিছনে নিয়ে গিয়ে আটকাল রানা, পিছন দিকে ধাক্কা দিল তাকে, মনিকার ধাক্কা খেয়ে যেদিকে তিনি পড়ে

যাচ্ছেন। চঙমঙ গঙ ভারসাম্য হারালেন, রানাকে নিয়ে পড়ে গেলেন তিনি। দু'জনেই ওরা নদীর খাড়া ঢালের ওপর পড়ল, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে, গড়াতে গড়াতে নেমে গেল নদীতে—ছ'ফুট গভীর লাল কাদা-পানিতে।

নদীতে পড়েই অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাদাপানির ওপর মাথা তুলল দু'জন। দু'জনেই বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে এখনও।

রানার একটা পা এখনও অবশ হয়ে রয়েছে। চঙমঙ গঙ হিংস্র ও ক্ষিপ্র। রানা উপলব্ধি করল, তাঁকে ধরে রাখা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। মনিকা দেখল বিপদে পড়ে গেছে রানা, ঝুঁকে বেয়োনেটটা তুলে নিল সে।

বেয়োনেট তুলে মনিকা আর দেরি করল না, লাফ দিল নদীর ঢাল লক্ষ্য করে, পা দুটো রয়েছে সামনে। ঢালের ওপর নিতম্ব দিয়ে পড়ল সে। পিছলে ও হড়কে নেমে আসছে। হাতে বাগিয়ে ধরা বেয়োনেট।

রানার ওপর আসীন হলেন চঙমঙ গঙ, ওর মাথার পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন ঘাড় ও গলা। মনিকার দিকে পিছন ফিরে আছেন তিনি, তাঁর সাফারি সুটের জ্যাকেট লাল কাদা লেগে চকচক করছে।

পিছন থেকে আঘাত করল মনিকা। আঘাত করল যতটা ওপর দিকে নাগাল পাওয়া সম্ভব। তার প্রথম আঘাতটা চঙমঙ গঙের পাঁজরে লেগে হড়কে গেল। দুর্বোধ্য কাতর আওয়াজ বেরুল চঙমঙ গঙের গলা থেকে, মোচড় খেল শরীরটা। বেয়োনেট তুলে আবার আঘাত করল মনিকা। এবার বেয়োনেটের ডগা কোন বাধা না পেয়ে দুই পাঁজরের মাঝখান দিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে।

রানার গলা ও ঘাড় ছেড়ে দিলেন চঙমঙ গঙ, কাদার ভেতর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঘুরে মনিকার দিকে ফিরলেন। তার পিঠের ওপর দিকে এখনও গাঁথা রয়েছে বেয়োনেট, ব্লেডটা প্রায় অর্ধেক ঢুকে গেছে।

দু'হাত বাড়িয়ে মনিকাকে ধরতে চেষ্টা করলেন তিনি, তাঁর কাদা মাখা চেহারায় পাশবিক আক্রোশ আর ঘৃণা ফুটে উঠল। ভারসাম্য ফিরে পেল রানা, লাফ দিয়ে পড়ল চঙমঙ গঙের পিঠে, দুই হাত দিয়ে টিপে ধরল গলাটা, সেই সঙ্গে চাপ বাড়িয়ে কাদার ভেতর ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল শত্রুকে। দু'জনের মাঝখানে পড়ে গেছে বেয়োনেটটা, ব্লেডের সবটুকু এবার সেঁধিয়ে গেল ভেতরে। মুখভর্তি রক্ত বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল চঙমঙ গঙের ঠোঁট থেকে, ভেসে গেল তাঁর চিবুক গলা ও বুক।

চাপ আরও বাড়াল রানা, কাদার ভেতর ডুবিয়ে দিল শত্রুর মাথা। লাল কাদার নিচে ধস্তাধস্তি করছেন চঙমঙ গঙ, তাঁর একটা হাত উঠে এল কাদার ওপর। হাতটা রানার মুখ খুঁজছে, বাঁকা আঙুলগুলো নাগাল পেতে চাইছে ওর চোখ দুটোর। শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে তাঁকে চেপে ধরে রাখল রানা, হাতটা পড়ে গেল। কাদার ভেতর চঙমঙ গঙের নড়াচড়া নিস্তেজ হয়ে এল।

হামাগুড়ি দিয়ে নদীর কিনারায় উঠে শুয়ে পড়ল মনিকা, চোখে আতংক, তাকিয়ে আছে রানা ও কাদার দিকে।

হঠাৎ কাদার ওপর মোটা আকৃতির কয়েকটা বুদবুদ মাথাচাড়া দিল।

এতক্ষণে খালি হয়েছে চণ্ডমণ্ড গণ্ডের ফুসফুস। একা শুধু রানার মাথা কাদার ওপর রয়েছে। আরও অনেকক্ষণ ওখানে শুয়ে থাকল ও, মুহূর্তের জন্যেও ডুবে থাকা চণ্ডমণ্ড গণ্ডের গলা থেকে হাত দুটো ঢিল করল না।

'মারা গেছে,' অবশেষে ফিসফিস করল মনিকা। 'এতক্ষণ বেঁচে থাকার কথা নয়।'

ধীরে ধীরে হাত দুটো আলগা করল রানা। কাদার তলায় কোন নড়াচড়া নেই। হামাগুড়ি দিয়ে নদীর কিনারায় উঠল ও। মনিকার পাশে শুয়ে পড়ল। ওকে জড়িয়ে ধরল মনিকা।

ধীরে ধীরে কাদার ওপর মাথাচাড়া দিল চণ্ডমণ্ড গণ্ডের লাশ। কাদা মাখা শরীরটাকে দেখে বোঝার উপায় নেই ওটা একটা মানুষের লাশ। ওটার দিকে একবার তাকিয়ে রানার বুকে মুখ গুঁজল মনিকা।

বিড়বিড় করে রানা বলল, 'লোকটা নিজের পাপের মধ্যে ডুবে মরল।'

- ঃ শেষ ঃ-

WWW.MURCHONA.COM
anmsumon@yahoo.com